বেঙ্গল টাইমস

নববর্ষ সংখ্যা

১৫ এপ্রিল, ২০২৫

ISSN 2445 5657 | bengaltimes.in

সম্পাদকীয়

নতুন বছরে ছোট্ট চাওয়া

বাঙালির জীবন থেকে বাঙালিয়ানা একটু একটু করে হারিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তারপরেও বছরের প্রথম দিনে সে 'শুভ নববর্ষ' বলতে কার্পণ্য দেখাত না। কিন্তু এবার এই দুটো শব্দ যেন কাঁটার মতো বিঁধছে। বাঙালির জীবনে 'শুভ' শব্দটাই কেমন যেন নির্মম রসিকতা মনে হয়।

সুপ্রিম কোর্টের রায়ে ছাব্বিশ হাজার শিক্ষক রাতারাতি কর্মহীন। তাঁদের সামনে কোনও দিশা নেই। হারানো কাজ, হারানো সম্মান তাঁরা আদৌ ফিরে পাবেন তো! রিভিউ পিটিশনে যোগ্য-অযোগ্য তালিকা দেওয়ার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার আদৌ আন্তরিকতা দেখাবে তো? সবমিলিয়ে পরিস্থিতি বেশ জটিল। একই কালো মেঘ এসে গ্রাস করছে প্রাইমারির ক্ষেত্রেও। সেখানে অনিয়ম ও দুর্নীতি আরও বেশি লাগামছাড়া।

একদিকে কর্মহীনদের হাহাকার। অন্যদিকে, দাঙ্গার ভয়াবহতা। মালদা, মুর্শিদাবাদ থেকে শুরু করে নানা জায়গায় অশান্তির আগুন। কেন্দ্র বা রাজ্য, আগুন নেভানোর বদলে আগুন জ্বালানোতেই যেন বেশি আগ্রহী। দু’পক্ষের তরফেই চলছে লাগাতার উস্কানি। ফলে, এক জেলার অশান্তি ছড়িয়ে পড়ছে অন্য জেলায়। এ কোন বাংলা? বছরের শুরুতেই প্রথম পাতায় যদি দাঙ্গা শিরোনাম হয়ে উঠে আসে, তাহলে ‘শুভ নববর্ষ’ বলা যায়!

নতুন বছরে বড় কিছু চাওয়ার মুখ নেই। খাদের কিনারে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষ কী আর চাইতে পারে! তাঁর কাছে প্রাণে বেঁচে যাওয়াই যেন বিরাট উপহার। একদিকে চাকরিহারাদের আর্তনাদ, অন্যদিকে ধর্মের উন্মাদনায় বারুদের স্তূপে থাকা বাংলা। এটুকুই চাওয়া, যোগ্য শিক্ষকরা কাজ ফিরে পান। দাঙ্গার আবহ দূর করে শান্তি ফিরে আসুক। উস্কানিমূলক আচরণে লাগাম আসুক। সত্যিই, এই সময়ে দাঁড়িয়ে এর বেশি চাওয়ার কিছুই নেই।

শুধু একটি বছর

রক্তিম মিত্র

আরও একটা নতুন বছর। অবশ্য নতুন বছর বললেই আমরা ইংরাজির ক্যালেন্ডার বদলের কথা ভেবে নিই। বাংলাতেও যে আলাদা একটা বছর আছে, সেটা আমরা ভুলেই যাই। বাংলার কোন মাস চলছে, অনেকেই বলতে পারি না। তারিখ তো দূর অস্ত। এমনকী এটা কোন বছর, সেই প্রশ্নেও অনেকক্ষণ ভাবতে হয়। বিস্তর ভাবার পর একটা ভুল উত্তর। আসলে, আমাদের দৈনন্দিন জীবন থেকে এভাবেই বাংলা যেন একটু একটু করে দূরে সরে যাচ্ছে।

পয়লা বৈশাখ অবশ্য কতগুলো অনুষঙ্গ নিয়ে আসে। আমরা নতুন পাঞ্জাবি পরি। শাড়ি আর গয়নার দোকান বিজ্ঞাপনে ভরিয়ে দেয়। কোন বাঙালি রেস্তোরাঁয় কী বিশেষ বাঙালি মেনু আছে, তা নিয়ে কাগজে ফিচার বেরোয়। টিভি খুললেও অ্যাঙ্করদের পরণে একটু অন্যরকম পোশাক। একটু অন্যরকমের আড্ডা, অনুষ্ঠান। আর সকাল হলেই হোয়াটসঅ্যাপের সুবাদে নানা রকমের পয়লা বৈশাখের মেসেজ। আমাদের বাঙালিয়ানা এটুকুতেই সীমাবদ্ধ। এর বাইরে বাংলার চর্চা থেকে অনেকটা বিরতই থাকি। আমাদের বাড়ির ছোট ছেলে-মেয়েরা ইংলিশ মিডিয়ামে যাওয়া বহুকাল আগেই শুরু করেছে। ইদানীং যেটা দেখা যাচ্ছে, তা হল, দ্বিতীয় ভাষা হিসেবেও বাংলা থাকছে না। সেখানেও বাঙালি বাড়ির ছেলেরা দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে হিন্দিকে বেছে নিচ্ছে। ফলে, আগে যে একটা পেপার বাংলা পড়তে হত, সেটুকুও আর হচ্ছে না। অভিভাবকরাও পরম গর্বে বলে বেড়াচ্ছেন, ‘ওর সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ তো হিন্দি। ওদের স্কুলে বাংলা পড়ানোই হয় না।’ স্কুলগুলিরও গর্বের সীমা নেই। অন্য কোনও রাজ্যে মাতৃভাষার প্রতি এমন উপেক্ষা আছে কিনা জানা নেই।

বাংলা এফএম-এ একটা বকচ্ছপ বাংলা বলা হয়। কিঁউকি, কেনকী এসব শব্দ আমাদের দৈনন্দিন সংলাপে অহরহ ঢুকে পড়ছে। সিরিয়ালের হাত ধরেও অবাধে ঢুকে যাচ্ছে হিন্দি গান। বাঙালির বিয়ে বাড়ির মেনু কার্ডও বদলে গেছে। বিয়ের আসরে এখন মেহেন্দি আর সঙ্গীত। পোশাক-পরিচ্ছদ পাল্টে যাচ্ছে।

গত এক বছরে একটা বই পড়েছেন, এমন বাঙালির সংখ্যা কত? রাজ্যের মোট বাঙালির ১ শতাংশ এমন পাওয়া যাবে? চারপাশ দেখে মনে তো হয় না। এক বছরে একটা ভাল বাংলা সিনেমা দেখেছেন, সেই সংখ্যাটাই বা কত? এক্ষেত্রেও সংখ্যাটা ২ শতাংশের বেশি হবে বলে তো মনে হয় না। আচ্ছা, গত এক বছরে অন্তত একবার লাইব্রেরি গেছেন, এমন বাঙালি কত? এক্ষেত্রেও সংখ্যাটা নিশ্চিতভাবেই এক শতাংশে পৌঁছবে না। এই নিয়ে কোনও সমীক্ষা হয়েছে বলে মনে হয় না। তবে, চারপাশে তাকালেই ছবিটা বোঝা যায়।

নতুন বছরে আমরা তাহলে কী করব? বাংলা ডেড ল্যাঙ্গুয়েজ, এটা বলে একটা বিকৃত আনন্দ পাব? নাকি হাহুতাশ করে যাব? এসব পন্থা ছেড়ে নিজেদের জীবন যাপনে যেন একটু হলেও বাংলাকে ফিরিয়ে আনতে পারি, সেই চেষ্টাই বোধ হয় করা উচিত। না, বাংলা ভাষার জন্য মিছিল করতে হবে না, প্রাণ দিতেও হবে না। মাসে অন্তত একটা ভাল বই পড়া, একটা ভাল বাংলা ছবি দেখা, অন্তত একটা চিঠি লেখা, কয়েকটা গান শোনা— এটুকু তো করতে পারি। তাহলেও পরের প্রজন্ম কিছুটা বাংলার ছোঁয়া পাবে। এটুকুও যদি না পারি, তাহলে পয়লা বৈশাখের পাঞ্জাবি বা শাড়ি পরে আদিখ্যেতা না করাই ভাল।

আগে কী সুন্দর দিন কাটাইতাম

কুন্তল আচার্য

পয়লা বৈশাখ ব্যাপারটা ঠিক কী? যখনই এই তারিখটা আসে, নানারকম জ্ঞানগর্ভ আলোচনা হাজির হয়ে যায়। ভারতের কোন কোন রাজ্যে কী নামে তা পরিচিত। কোন রাজার হাত ধরে কীভাবে এর বিস্তার ইত্যাদি ইত্যাদি। আর কেউ একটা যদি ফেসবুকে ছাড়ল, তাহলে তো কথাই নেই। একদল সেটাকে শেয়ার করতে ব্যস্ত রইল। আরেকদল বলা নেই, কওয়া নেই, কপি পেস্ট করে নিজের নামে ঝেঁপে দিল। তারপর সারাদিন লাইক গুনতে লাগল।

যাক গে সেসব কথা। আমাদের ছোটবেলাটা ছিল বড় অদ্ভুত। আমাদের সময় টিভিও সেভাবে মফস্বলে ঢোকেনি। আর সেলফোন, গুগল, ফেসবুক তো অনেক পরের ব্যাপার। এসব শব্দ তখন কালের গর্ভে। সে ছিল এক নিখাদ আনন্দের দিন। এমনিতে তখন শীত অনেকটাই লম্বা ছিল। এই সময়টায় পরীক্ষার ভ্রুকুটি ছিল না। এই সময়টায় গাজন, মেলার ধুম। কবে কোথায় মেলা হবে, তার একটা মোটামুটি ক্যালেন্ডার ছিল। সেই অনুযায়ী আশেপাশের কোনও মেলা বাদ দিতাম না।

কিন্তু পয়লা বৈশাখ ছিল অন্য কারণে

আনন্দের। দোকানগুলো দারুণভাবে সেজে উঠত। অনেক দোকানের বাইরে ফুল টাঙানো হত। ঝাড়পোছ চলত। অনেক দোকানের বাইরে চেয়ার পেতে, ছোটখাটো প্যান্ডেল সাজানো হত। যেসব দোকানে সারা বছরের টুকটাক কেনাকাটা, সেইসব দোকানে একবার করে হাজিরা দেওয়া। কোনওটা বড়দের সঙ্গে। কোনওটা আবার বন্ধুদের সঙ্গে। কোনও দোকানে মিষ্টির প্যাকেট। কেউ আবার বসিয়েই মিষ্টি খাওয়া-তেন। দোকানিদের প্রণাম করতাম। অন্যান্য বড়দেরও প্রণাম করতাম।

তবে মিষ্টি বা লাড্ডুকে ঘিরে অবশ্য আমাদের সেই আবেগ ছিল না। তাই আমরা খোঁজ নিতাম, কোন দোকানে লস্যি খাওয়াচ্ছে। কোন দোকানে কোল্ড ড্রিঙ্কস খাওয়াচ্ছে, কোন দোকানে আইসক্রিম দিচ্ছে। ছোটদের জন্য এইসব আয়োজনও থাকত। আমাদের সময়ে গোল্ড স্পট বলে এক ধরনের কোল্ড ড্রিঙ্কস ছিল। এমন সুন্দর একটা পানীয় কোথায় যে হারিয়ে গেল! এভাবেই কত দোকানে যে ঢুঁ মারতাম! দোকানিরাও ছিলেন দিলখোলা। সেই দোকানে জিনিস না নিলেও তাঁদের মধ্যে নি-মন্ত্রণের ছুৎমার্গ ছিল না। ডেকে ডেকে খাওয়াতেন। আমরাও সেই মতো আশপাশে ঘুরঘুর করতাম।

প্যাকেটগুলো নিয়ে বাড়িতে ফিরতাম। আর দেওয়া হত ক্যালেন্ডার। ওতে অবশ্য আমাদের তেমন আগ্রহ ছিল না। কারণ, বাংলা ক্যালেন্ডার মানেই বড্ড বোরিং। সেই ঠাকুর দেবতার ছবি। ওতে তেমন মতি ছিল না। ফলে, সেগুলো ঘরের লোকেদের হাতে তুলে দিয়ে তাঁদের ধন্য করতাম।

তখন পয়লা বৈশাখ মানেই ছিল হালখাতা। অনেক দোকানে নাকি ধার দেনা শোধ করতে হয়। অনেকে দেখতাম, দোকানির হাতে কয়েকশো টাকা ধরিয়ে দিচ্ছেন। দোকানিও সেগুলো খাতা দেখে মিলিয়ে নিচ্ছেন। কেউ আবার হিসেব–টিসেবে যাচ্ছেন না। কে কত জমা করল, জাস্ট লিখে রাখছেন। হিসেবে পরে হবে। আমরা অবশ্য এসব চক্করে ছিলাম না। আমাদের টাকা কোথায় যে ধার মেটাব! ও বাবা–কাকাদের কাজ। আমরা বুঝি লস্যি, আমরা বুঝি কোল্ড ড্রিঙ্কস। কে কেমন খাওয়াল, এটাই ছিল আমাদের কাছে সেই দোকানের ইউএসপি। কার দোকানে মাল কেমন, কে সস্তায় দেয়, কার ব্যবহার কেমন, এগুলো বড়রা বুঝুক, আমাদের বুঝতে বয়েই গেছে।

সবমিলিয়ে আমাদের কাছে পয়লা বৈশাখ ছিল অন্য এক উন্মাদনা। যার অনেকটাই হারিয়ে গেছে। এখনকার পয়লা বৈশাখের সঙ্গে সেদিনের সেই নির্মল আনন্দের কোনও তুলনা হবে না। সত্যিই, আগে কী সুন্দর দিন কাটাইতাম।

শরৎ, হেমন্ত, বসন্ত আসলে গ্রীষ্মের তিন রূপ

তৃষাণ রুদ্র

জিজ্ঞাস করুন, এটা বাংলার কোন সাল। অধিকাংশক্ষেত্রেই আপনি সঠিক উত্তর পাবেন না। উত্তরদাতা হয় ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকবেন। নইলে, উনিশশো, দুহাজার এইসব বলে থমকে যাবেন। নইলে অতি চালাকি করে এড়িয়ে যাবেন। বলবেন, এখন এগুলো মনে রাখার কোনও দরকার নেই। এগুলো সব সেকেলে ব্যাপার।

সত্যিই তাই, বাংলা সাল, বাংলা তারিখ এগুলো কেমন যেন গুরুত্ব হারিয়েছে। অবশ্য এর জন্য প্রকৃতির খামখেয়ালিপনাও অনেকটাই দায়ী। ছোট থেকে যে ঋতুচক্রের কথা পড়েছিলাম, সেই সব ঋতু গুলো কোথায় যেন ভ্যানিস হয়ে গেল। আচ্ছা, শরৎ কাল কালে বলে? হেমন্ত বা বসন্ত বলেও কার্যত কিছুই নেই। শুনতাম, পৌষ-মাঘ এই দুম মাস নাকি শীতকাল। ও হরি, কোথায় বা কী? মেরেকেটে শীত এখন দশ-বারো দিনের অতিথি। তাও একটানা নয়। জানুয়ারির শুরুতে হয়ত একঝটিকায় তিনদিন। দিন পনেরো পরে অস্তিত্বের জানান দিতে হয়ত আরও তিন-চার দিন। আর বর্ষা! মাঝে মাঝে টানা হয় ঠিকই। কিন্তু সেও আর দু'মাসের ঋতু নেই। সবমিলিয়ে দিন পনেরো।

তাহলে, মোদ্দা কথাটা কী দাঁড়াল? বছর অন্তত দশ মাস গরম কাল। বাকি দু'মাসের কিছুটা বর্ষা, কিছুটা শীত। বাঙালির এখন ঘরে এসি, অফিসে এসি, পার্টি অফিসে এসি, ক্লাবঘরেও এসি। ফলে, ঘরকুনো বাঙালি ঘরের মধ্যে থাকলে গরমটা বুঝতেও পারে না। বাইরে বেরোলে বুঝতে পারে। কিন্তু বাইরে বেরোনোও কমিয়ে দিয়েছে। আর ঘরে আটকে রাখার মোক্ষম অস্ত্র হিসেবে এসেছে স্মার্টফোন। সে সারাদিন স্মার্ট ফোনেই মুখ গুঁজে। ফলে, ঘরের ভেতরের বা বাইরের ঋতুচক্র নিয়ে ভাবতে তার বয়েই গেছে। সে খুব গরম এলে বড়জোর, দু একটা গরমের পোস্ট শেয়ার করে।

আমাদের ছোটবেলায় শরৎকাল, বসন্তকাল নিয়ে রচনা আসত। কেউ কেউ ঝেড়ে মুখস্থ করত। আবার কেউ কেউ নিজেদের অভিজ্ঞতা মিশিয়ে এটা-সেটা কিছু একটা লিখে আসত। এখনকার যা সিলেবাস, বোধ হয় এসব রচনা আর আসে না। আর এলেও বানিয়ে লেখা বোধ হয় সম্ভব নয়। কারণ, শরৎকালের সঙ্গে বসন্তকালের কী ফারাক, দৈনন্দিন জীবনে তা বুঝে ওঠার সত্যিই কোনও উপায় নেই। দুটোই আসলে গরমকালের দুই রূপ।

স্মৃতিটুকু থাক

সেদিন চৈত্রমাস

অন্তরা চৌধুরি

কথায় বলে চৈত্র মাস মধুমাস। অবশ্য এখন এই কথা কাউকে বললে একটা মারও আমার পিঠের বাইরে পড়বে না। কারণ গত কয়েক দিনের তীব্র দাবদাহে চৈত্র মাসকে আর অন্তত মধুমাস বলা যায় না। বরং যা লু বইছে, ধু ধু মাস বলা যেতে পারে। কিন্তু একটা সময় ছিল, যখন সারা বছর ধরে এই চৈত্র মাসের জন্যই অপেক্ষা করতাম। স্মৃতির সরণি বেয়ে আবার একটু ফিরে যাই ছোটোবেলায়।

চৈত্র মাস পড়তে না পড়তেই আমাদের বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন ছোট ছোট জনপদে শুরু হয়ে যেত শিবের গাজন। আমরা দিন গুনতাম, কবে সেই গাজন দেখতে যাব! মনে আছে, একবার অনেক ছোটবেলায় পিসিমণির শ্বশুরবাড়ি বর্ধমান জেলার মিঠানীতে গিয়েছিলাম। সেখানে খুব জাঁকজমক সহকারে চব্বিশ প্রহর হয়। আমার কাছে তখন 'চব্বিশ প্রহর' নামটা নতুন ছিল। মানেটাও বুঝতাম না। পরে জানলাম, সারা দিন-রাত ধরে নাম হরি নাম সংকীর্তনকেই চব্বিশ প্রহর বলে। সেই নাম গান এক মিনিটের জন্যও থামবে না। এক দল কীর্তন করে উঠে যেতে না যেতেই আরেকদল কীর্তন শুরু করে দেবে। সেই উপলক্ষ্যে গোটা গ্রাম জুড়ে বিশাল মেলা বসত। গ্রামে প্রত্যেকের বাড়িতে বাড়িতে অতিথি। খাওয়া দাওয়ার এলাহি আয়োজন। ওদিকে চৈত্র মাসের শুরুতেই আমাদের বাঁকুড়ার শুশুনিয়া পাহাড়ে শুরু হয়ে যায় ধারার মেলা। সেই শুরু। তার পর এক এক করে এক এক জায়গায় গাজন শুরু হয়ে যায়।

আমি তখন বেশ ছোট। অর্থাৎ বাবা, কাকার সাইকেলে চেপে অনায়াসেই ইতি উতি ঘুরে বেড়াতে পারি। আমার তিন কাকাই আমাকে বড় বেশি ভালোবাসত। এক একজন কাকার একেক রকম বৈশিষ্ঠ্য ছিল। সেই ছোট্ট বয়সে আমি ছিলাম তাদের প্রাণের সঙ্গী। একদিন খবর পেলাম, আমাদের বাড়ির কাছে শালবনীতে গাজন হচ্ছে। বাবুকাকা বলল, 'চল আজকে তুই আর আমি মেলা দেখতে যাব।' সন্ধ্যে বেলায় আমি তো রেডি হয়ে বসে আছি। কিন্তু বাবুকাকার পাত্তা নেই। কারণ, তিনি ছিলেন অন্য কাকাদের তুলনায় একটু অতিরিক্ত শৌখিন। ঘন্টাখানেক ধরে স্নানটান সেরে বেশ ধোপদুরস্থ জামাকাপড় পরে তাঁর আবির্ভাব হল। এক ঝলক দেখলে মনে হবে বিয়ে বাড়ি যাচ্ছে। চুলে শ্যাম্পুর গন্ধ আর বিল ক্রিমের গন্ধে চারিদিক ম ম করছে। গালটা বেশ চকচক করছে। চুল ফুরফুর করছে।

কম বয়সে বাবুকাকাকে অনেকটা রাজেশ খান্নার মতোই দেখতে ছিল। অসম্ভব ফর্সা, তার সঙ্গে মিশেছে লালচে আভা। তার সাইকেল খানাও পক্ষীরাজ ঘোড়ার চেয়ে কোনও অংশে কম ছিল না। অর্থাৎ সেই সময় রাস্তা দিয়ে গেলে লোকজন বেশ তাকাত। তারপর সন্ধ্যেবেলায় বাবুকাকার সেই পক্ষীরাজে চেপে আমরা পৌঁছে গেলাম শালবনীর গাজনে। সেখানে আমাদের বাড়িতে যে মাছ দিত, সেই নিতাই কাকুর বাড়ি ছিল, সে আমাদের মেলায় দেখতে পেয়ে টানতে টানতে তার বাড়িতে নিয়ে গেল। তারপর লুচি, ঘুগনি, পায়েস, মিষ্টি বেশ জম্পেশ করে খাইয়ে তবে ছাড়ল।

এদিকে, গাজন ততক্ষণে বেশ জমে উঠেছে। চারিদিকেই অজস্র লটারির দোকান। সে বিভিন্ন রকমের লটারি। সবচেয়ে বেশি ডিম লটারি। সাবান লটারি থেকে শুরু করে নারকেল তেল লটারিও রয়েছে। লটারি ব্যাপারটা কী অত ছোট বয়সে আমি ঠিক বুঝতাম না। কিন্তু দেখতে বড় ভালো লাগত। বাবুকাকা অনায়াসে ডিম লটারি খেলতে বসে গেল। তখন ডিম লটারি ছিল কুড়ি পয়সার। দেখি যেখানেই পয়সা দিচ্ছে সেখানেই ডিম পেয়ে যাচ্ছে। সে এক দারুণ মজার ব্যাপার। প্রথম পর্যায়ে প্রায় চল্লিশ খানা ডিম পাওয়া গেছে। আমার তো খুব আনন্দ। আমি বরাবরই ডিম খেতে বড্ড ভালোবাসি। ভাবছি কখন বাড়ি গিয়ে ডিমগুলো সাঁটাব। তার পর শুরু হল বাবুকাকার সাবান লটারি খেলা। তখন বেশ বড় বড় মোতি সাবান ছিল। সেবারে বাবুকাকা প্রায় কুড়িখানা মোতি সাবান আর পাঁচখানা নারকেল তেলের কৌটো জিতল।

কিন্তু লটারি ওরফে ডিম জেতার নেশা কঠিন নেশা। বাবুকাকা আবার ডিম লটারি খেলতে শুরু করল। তারপর বেশ রাত করেই বাড়ি ফিরলাম। গুণে দেখা গেল মোট সাতষট্টি খানা ডিম পাওয়া গেছে। তখন বাড়িতে অনেক লোক যদিও। সকলেরই বেশ দু তিনখানা করে ভাগে জুটবে। সেই নিয়ে বেশ মজা সকলেরই। এদিকে গোটা দুয়েক নিয়ে খেতে গিয়ে দেখি খোলা ছাড়ানোই যাচ্ছে না। কারণ ভালো করে সেদ্ধ

হয়নি। তখন বাড়িতে গ্যাস ছিল না। কাজেই অত রাত্রিরে আবার অতগুলো ডিমকে মাটির খোলায় সেদ্ধ করে ঠাকুমা রান্না করল। সেদিন বাড়ির সকলে মিলে পরমানন্দে খাওয়া হল ভাত আর লটারি থেকে পাওয়া ডিমের ঝোল।

তার পর থেকে বাবুকাকার সঙ্গে গাজন দেখতে যাওয়াটা একটা নেশার মতো হয়ে গিয়েছিল। তাছাড়া এই সমস্ত প্রত্যন্ত গ্রামীণ মেলা বা গাজনে একটা অদ্ভুত আনন্দ বা মাদকতা আছে; যা অধুনা কর্পোরেট মেলায় নেই। প্রাণ নেই। সবচেয়ে বড় আকর্ষণ ছিল হাতে ঘোরানো নাগরদোলা। কাঠের তৈরি সেই ছোট্ট নাগরদোলায় চাপতে কী ভালোই না লাগত! যে লোকটা ঘোরাত সে মুখের মধ্যে একটা অদ্ভুত আওয়াজ করত। আর নাগরদোলায় ঘুরতে ঘুরতে আনন্দে মেশানো এক অদ্ভুত হাসি আমাদের কিছুতেই থামত না। এখন মনে হয় কত দিন সেই হাসি হাসিনি। তারপর যখন কাকাদের সঙ্গে সাইকেলে চাপার বয়স ফুরোল, তখন মা কাকিমাদের সঙ্গে মেলায় যেতাম। আমি, মা, কাকিমা, ভাই আর কুট্টুস। এই জুটিটা আমাদের দারুণ ছিল।

মেলাতে ঘুরতে ঘুরতে ধুলোর চোটে মাথার চুল লাল হয়ে যেত। কিন্তু রুমাল দিয়ে নাখ ঢাকার বালাই ছিল না। সেই ধুলো ছিল বড় মিষ্টি। কত বিচিত্র খাবার যে এই সমস্ত মেলায় পাওয়া যেত তার ঠিক নেই। বাবাই গাজনের সময় ভোরবেলায় এক্কেশ্বর যেত। আর সেখান থেকে নিয়ে আসত কুলগুঁড়ো। ওই কুলগুঁড়ো শুধুমাত্র এক্কেশ্বরের গাজনেই পাওয়া যেত। গ্রীষ্ম কালের দিনে নুন, লঙ্কা, তেল দিয়ে ওই কুলগুঁড়ো মেখে ভাত খাওয়ার স্বাদই আলাদা। তবে শুধু কুলগুঁড়ো নয়। আসন্ন বৈশাখের কথা ভেবে তার সাজ সরঞ্জাম ওই চৈত্রের মেলাতেই কিনে নেওয়া হত। যেমন তালপাতার পাখা, মাটির কুঁজো, কলসী, মাদুর, লাটাই, শীতলপাটি ইত্যাদি। তখ-নকার দিনে বড় বেশি লোডশেডিং হতো। তাই সেই গ্রীষ্মের দুপুরে কুজোঁর জল খেয়ে মাটিতে শীতলপাটি বিছিয়ে ঠাকুমার কাছে শুয়ে পড়তাম। ঠাকুমা সারা দুপুর তালপাতার পাখা দিয়ে হাওয়া করত আর রামায়ণ মহাভারতের গল্প বলত। এখন মনে হয় সে এক রূপকথার জগৎ ছিল।

তারপর এই চৈত্র বৈশাখ মাসে আমাদের বাড়িতে সন্ধ্যে বেলায় হতো হরির লুঠ। তুলসী থানে পুজো করার পর চারিদিকে বাতাসা ছড়ানো হতো। আমাদের সব ভাইবোনদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে যেত সেই বাতাসা কুড়োনোর। আর সেই বাতাসাগুলো খেতে কেন যে এত ভালো লাগত বুঝি না। ছোটবেলার সব কিছুই বড় মধুময়, বড় প্রাণময় তাই না!

এখন ফোনে খবর পাই অমুক জায়গায় গাজন হচ্ছে, মেলা বসেছে। ভেতরটা ছটফট করে। কলকাতার এই জনবহুল মহানগরীতে বসেও একাকীত্বের দীর্ঘশ্বাস আরও আরও প্রগাঢ় হয়। তবে সেই গাজনে যাওয়ার অভ্যেসটা বাবুকাকা আজও বজায় রেখেছে। তবে একা নয়, কুট্টুসকে নিয়ে যায়। সেই ঝাঁ চকচকে সাইকেলটা আর নেই। বাহন এখন মটর বাইক। বাবুকাকাও আগের মতো ঝাঁ চকচকে নেই। সময়ের পলেস্তারা শরীরে পড়লেও মনে অন্তত পড়েনি। তাই আজও বাবুকাকা ডিম লটারি খেলে। সাতষট্টিটা না হোক; অন্তত গোটা দশেক তো আনেই। আর টাইম মেশিনে চেপে আজও বাবুকাকার পাশে দাঁড়িয়ে থাকে সেদিনের সেই ছোট্ট মেয়েটা। সে অবাক বিস্ময়ে দু চোখ ভরে দেখে, শুধু দেখে!

পায়ে হেঁটেই নববর্ষের আড্ডায় হাজির দাদাঠাকুর

পোশাকি নাম সবিতেন্দ্রনাথ রায়। বইপাড়ায় জনপ্রিয় নাম ভানুবাবু। নববর্ষ মানেই তাঁর দোকানে লেখকদের জমজমাট আড্ডা। অনেক স্মৃতি সযত্নে আগলে রেখেছেন। তাঁর সঙ্গে আলাপচারিতায় স্বরূপ গোস্বামী।।

কখনও এসে গান ধরেছেন দাদাঠাকুর। কখনও আপন মনে কবিতা বলে চলেছেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়। তরুণদের উৎসাহ দিচ্ছেন তারাশঙ্কর। আবার খুব সঙ্কোচে নিজের নতুন লেখার কথা শোনাচ্ছেন শঙ্কর। কখনও হাজির হেমন্ত্ মুখোপাধ্যায়, তো কখনও আসর জমিয়ে দিচ্ছেন ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়। পুরাতনী টপ্পা ধরছেন বুদ্ধদেব গুহ, নীরব শ্রোতা লীলা মজুমদার। নববর্ষ মানেই টুকরো টুকরো এমন নানা মুহূর্ত। নববর্ষ মানেই মিত্র অ্যান্ড ঘোষ-এর সেই জমজমাট আড্ডা। দুপুর গড়িয়ে যেত বিকেলের দিকে, সন্ধে গড়িয়ে যেত রাতে। এক প্রজন্মের সঙ্গে দিব্যি মিশে যেত আরেক প্রজন্ম। কিন্তু এসব আড্ডার কথা কে আর শোনাবেন! পুরনো মানুষেরা একে একে সবাই প্রায় চলে গেছেন। কিন্তু পুরনো অনেক স্মৃতি আগলে বসে আছেন এক প্রবীণ প্রকাশক।

হ্যাঁ, তিনি মিত্র অ্যান্ড ঘোষ-এর কর্ণধার সবিতেন্দ্রনাথ রায়। প্রকাশনার জগৎ যাঁকে একডাকে চেনে ভানুবাবু নামে। বয়স আশির গন্ডি ছাড়িয়েছে অনেকদিন। বয়স এখনও সেভাবে থাবা বসাতে পারেনি স্মৃতিতে। এখনও উঠে পড়েন সাতসকালে। নানারকম বই, ম্যাগাজিন পড়তে থাকেন। নিজের হাতে প্রুফ দেখেন। বারোটা

বাজতে না বাজতেই হাজির হয়ে যান কলেজ স্ট্রিটের মিত্র অ্যান্ড ঘোষ-এ। লেখকরা আসেন, পাঠরাও আসেন। অনেক নতুন পাণ্ডুলিপি পড়তে হয়। সন্ধে পর্যন্ত সেখানেই কেটে যায়। ফিরে এসেও বসে পড়েন বই নিয়ে। ভদ্রতা বা সৌজন্যে কোনও কার্পণ্য নেই। ফোন করে এক সন্ধেয় হাজির হয়েছিলাম তাঁর ঢাকুরিয়ার বাড়িতে। বাড়ি নয়, যেন জীবন্ত এক ইতিহাস। কত কিংবদন্তি সাহিত্যিকের স্মৃতি বিজড়িত সেই ঘর। কথায় কথায় নববর্ষের আড্ডা। কখনও নববর্ষকে ছাপিয়ে উঠে এল প্রকাশনা জগতের অনেক অজানা কথা। সেই আলাপচারিতার কিছুটা নির্যাস বরং তুলে ধরা যাক।

প্রশ্নঃ বাংলা নববর্ষ মানেই তো আপনার দোকানের সেই জমজমাট আড্ডা।

ভানুবাবুঃ হ্যাঁ, দেখতে দেখতে সেই আড্ডার বয়স সাতষট্টি বছর হয়ে গেল। মিত্র অ্যান্ড ঘোষ-এর পথ চলা শুরু ১৯৩৪-এ। খুব অল্প বয়সেই আমি এই ব্যবসার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ি। তবে নববর্ষের আড্ডা বলতে যা বোঝায়, তা শুরু হয় ১৯৪৯ নাগাদ। তখন থেকেই বিভিন্ন সাহিত্যিকরা আসতেন। যত দিন গেল, সেই আড্ডার কথা ছড়িয়ে গেল। সেই সময়ের অধিকাংশ বড় বড় লেখকই একবার না একবার ঢুঁ মেরে যেতেন সেই আড্ডায়। তবে পয়লা বৈশাখ খুব ভোরেই যাই দক্ষিণেশ্বরে পুজো দিতে। সেখান থেকে বাড়ি ফিরে বারোটা নাগাদ যাই দোকানে। তখন থেকেই সাহিত্যিকদের আসা যাওয়া শুরু। একেক সময় একেকজন আসতেন। আড্ডা চলত রাত নটা-দশটা পর্যন্ত।

প্রশ্নঃ সেই আড্ডায় নাকি দাদাঠাকুর শরৎচন্দ্র পণ্ডিতও আসতেন। তিনি আসা মানেই অনেক মজার মজার ঘটনা। সেগুলো মনে পড়ছে ?

ভানুবাবুঃ দাদাঠাকুর মানেই এক বর্ণময় চরিত্র। তিনি বেশ কয়েকবার এসেছেন এই আড্ডায়। আর তিনি থাকা মানে তিনিই হয়ে উঠতেন মধ্যমণি। আমাকে খুব স্নেহ করতেন। একবার ব্র্যাবোর্ন রোডে তাঁর সঙ্গে দেখা। বললাম, যাবেন না ? বললেন, হ্যাঁ, তোদের ওখানে তো একবার যেতেই হবে। আমি বললাম, দাঁড়ান, একটা ট্যাক্সি ডেকে আনি। উনি বললেন, 'ট্যাক্সির দরকার নেই। দা আছে দুটো, কুডুল আছে একটা। কাটতে কাটতে চলে যাব।' দা-কুডুল মানে বুঝলাম না। তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম। বললেন, ওরে, আমার নামের শুরুতেই দাদা, অর্থাৎ দুটো দা। আর ঠাকুরকে একটু উল্টে-পাল্টে দিলেই কুঠার হয়ে যাবে। পায়ে হেঁটেই চলে এলেন। এসে একাই জমিয়ে দিলেন। গান ধরলেন কলকাতা ভুলে ভরা। আড্ডায় সজনীকান্ত দাসও হাজির। তিনি দাদাঠাকুরকে বললেন, 'দাদাঠাকুর, কোথায় যাবেন, বলুন। আমার সঙ্গে গাড়ি আছে। আপনাকে ছেড়ে দেব।' দাদাঠাকুর বললেন, 'সারা জীবনে অনেক পাপ করেছিস, আমাকে গাড়ি চাপিয়ে একটু পুণ্যি সঞ্চয় কর।' সজনীকান্ত বললেন, কেন, কী পাপ করেছি ? দাদাঠাকুর বললেন, 'কত নিপাতনে সিদ্ধ লেখককে মেরে ফেলেছিস। দিকপাল সব লেখককে কত গালমন্দ করেছিস। এটা পাপ নয় !'

প্রশ্নঃ আর কারা আসতেন ?

ভানুবাবুঃ কাকে ছেড়ে কার কথা বলব ?

তারাশঙ্কর থেকে নীহাররঞ্জন গুপ্ত। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত থেকে প্রমথনাথ বিশী, সজনীকান্ত

দাস, লীলা মজুমদার, আশাপূর্ণা দেবী, মহাশ্বেতা দেবী, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব গুহ, শঙ্কর, নিমাই ভট্টাচার্য, নলিনীকান্ত সরকার, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সমরেশ মজুমদার। এখনও সেই আড্ডা বসে। এখন এই প্রজন্মের লেখকরা আসে। ভগীরথ মিশ্র তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, বাণী বসু, প্রচেত গুপ্তরা একবার না একবার ঠিক আসে। বুদ্ধদেব গুহ নিয়মিত আসতেন। পুরাতনী টপ্পা গাইতেন। কিন্তু স্ত্রী ঋতু গুহ মারা যাওয়ার পর থেকে আসেননি। কেউ প্রবীণ, কেউ আবার তখন সবে সাহিত্য জগতে পা রেখেছেন। নবীন-প্রবীণ মিলে যেত ওই একটা দিনে।

প্রশ্নঃ শুধু লেখকরা ? অন্য জগতের লোকেরা আসতেন না ?
ভানুবাবুঃ হ্যাঁ, তাও আসতেন। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় এসেছিলেন। সবাই গান গাওয়ার আবদার করল। হেমন্তবাবু বললেন, গান করতে তো আসিনি। এসেছি গজেন্দ্রবাবুর সঙ্গে দেখা করতে। সবাই মিলে কত আড্ডা হচ্ছে, এই তো ভাল। ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় তো প্রতিবারই আসতেন। তিনি থাকলে যা হয় ! একাই আসর জমিয়ে দিতেন। একবার ভানু বাবু একটা বইয়ের ব্যাপারে আগ্রহ দেখালেন। আমি বললাম, কাউন্টারে যাবেন নাকি ! ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন, কাউন্টারে দাঁড়িয়ে বই কিনব ? ক্ষেপেছিস ? আমাকে বই কিনতে দেখলেই লোকজন গালাগাল দেবে। বলবে, এই দেখ, শালা ভানুও বই পড়ছে। উত্তম কুমার বই পড়লে ক্ষতি নেই। আমি বই পড়লেই যত দোষ। যেন আমার বই পড়ারও যোগ্যতা নেই।' একবার বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রকে নিয়ে এক সমস্যা। বীরেনবাবুর সঙ্গে ছিলেন দেবনারায়ণ গুপ্ত। তিনি এসেই বললেন, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ অভদ্র। এক ট্রামে একসঙ্গে এলাম। কোনও কথাই বলল না। যা জিজ্ঞেস করলাম, শুধু হুঁ হুঁ করে গেল। এ কেমন ভদ্রতা ? তখন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ বললেন, 'মুখ খুলে কি বিপদ বাড়াব ? মুখ খুললেই তো আওয়াজ শুনে লোকে বুঝে যেত, বীরেন্দ্র ভদ্র যাচ্ছে। এরকম নানা টুকরো টুকরো ঘটনা। সব একসঙ্গে মনেও পড়ে না।

প্রশ্নঃ সেদিন এত লেখককে সামাল দিতেন কী করে ? সবাই কি মাটিতেই বসতেন ?
ভানুবাবুঃ দোকানে বসার জায়গা কোথায় ? দোকান তো বইয়ে ঠাসা। পয়লা বৈশাখ বিক্রি একটু বেশি হয়। ফলে, আরও বেশি বই রাখতে হত। এর মাঝে আলাদা করে বসার আয়োজন করা মুশকিল হয়ে যেত। তারই মাঝে কিছু চেয়ার, কিছু টুল থাকত। অনেকে মাটিতেও বসতেন। তাছাড়া, সবাই তো একসঙ্গে থাকতেন না। কেউ হয়ত দুপুরে এসে ঘণ্টাখানেক থেকে চলে যেতেন। কেউ আসতেন বিকেলের দিকে। সবমিলিয়ে কুলিয়ে যেত। সমস্যা হত না। আসলে, কে টুলে বসলেন, কে বইয়ের উপরে বসলেন, এসব ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে কেউ মাথাও ঘামাতেন না। সবাই একসঙ্গে হই হুল্লোড় করতেন, সেটাই আসল কথা।

প্রশ্নঃ নিশ্চয় খাওয়া দাওয়ার আয়োজন থাকত। লেখকদের কী উপহার দিতেন ?
ভানু বাবুঃ সকাল থেকেই শুরু হয়ে যেত খাওয়া দাওয়ার পর্ব। সারাক্ষণই চলত। কখনও মিষ্টি, কখনও নোনতা। আলুর দম, ফুচকা, চুরমুর, সব ব্যবস্থাই থাকত। আর দফায় দফায় চা, কফি, শরবত তো আছেই। কেউ ভোজনরসিক,

তিনি হয়ত একটু বেশি খেলেন। কেউ বাড়ি থেকে খেয়ে আসতেন। তিনি দু একটা মিষ্টি মুখে তুলতেন। কেউ প্যাকেটে করে বাড়ি নিয়ে যেতেন। সবমিলিয়ে একটা উৎসবের পরিবেশ থাকে। লেখকদের নানারকম উপহার দেওয়া হয়। দামি পেন, ফোল্ডার, বই তো থাকেই। বিভিন্ন বছরে নানারকম উপহার। তবে উপহার যা দেওয়া হবে, সবাইকে একইরকম। বই দেওয়া হলে, সবাইকে একইরকম বই দেওয়া হয়। তবে জীবিত লেখকদের বই সাধারণত দেওয়া হয় না। এক লেখকের বই দেওয়া হলে অন্য লেখকের খারাপ লাগতে পারে। তাই মৃত লেখকদের বইই দেওয়া হয়। একবছর দিয়েছিলাম 'খেয়ালখুশির খাতা।'

প্রশ্নঃ খেয়াল খুশির খাতা! সেটা আবার কার লেখা ?

ভানুবাবুঃ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন লেখকরা এসে একটা খাতায় যা খুশি লিখে রাখতেন। নানা মজার মজার মন্তব্য। সমস্ত দিকপাল সাহিত্যিকদের নানা মজার কথা আছে এই খাতায়। একটা ঐতিহাসিক দলিলও বলতে পারেন। সেই মন্তব্য গুলোই দু বছর আগে বইয়ের আকারে প্রকাশ করা হয়েছিল। সাহিত্যের অনেক অজানা দিক সেখানে আছে।

প্রশ্নঃ শুনেছি, পয়লা বৈশাখ নাকি লেখকদের সম্মান দক্ষিণাও দেওয়া হয়। আপনার এখানেও কি সেই ট্রাডিশন আছে ?

ভানুবাবুঃ হ্যাঁ, এই ট্রাডিশনটা অনেকদিনের পুরানো। পয়লা বৈশাখ লেখকদের প্রাপ্য টাকা দেওয়া হয়। তবে সবসময় পুরোটা দিতে পারি না। চেষ্টা করি, ওই দিন অন্তত কিছুটা দেওয়ার।

সবার পাওনা সমান হয় না। কারও হয়ত পাঁচটা বই আছে, কারও একটা। কারও নতুন বই নেই, কিন্তু পুরানো বই বাবদ রয়্যালটি আছে। তাই সবার টাকার অঙ্কটা সমান হয় না। যার যেমন পাওনা, সেই অনুযায়ী আলাদা আলাদা খাম তৈরি থাকে।

প্রশ্নঃ ওই দিন কি বইয়ে উদ্বোধনও হয় ?

ভানুবাবুঃ হ্যাঁ, অনেক লেখক ওই দিন বই প্রকাশ করতে চান। তবে এখন আর ঘটা করে উদ্বোধন করি না। এর একটা কারণ আছে। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তর লেখা পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ বইটার কথা নিশ্চয় শুনেছেন। ওই বইটা পয়লা বৈশাখ বেরিয়েছিল। দাম ছিল কুড়ি টাকা। সেদিন বিশেষ ছাড় দেওয়া হয়েছিল। বই কেনার জন্য এমন হুড়োহুড়ি, সামাল দেওয়াই মুশকিল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। একদিনে দশ হাজার কপি শেষ। কলেজ স্ট্রিটের অন্য প্রকাশকদের ব্যবসা সেদিন প্রায় বন্ধ হয়ে গেল। সেই থেকে আর ঘটা করে উদ্বোধন হয় না। তবে ওই দিন পাঠকদের মধ্যেও বই কেনার একটা বাড়তি তাগিদ থাকে। অন্যান্য দিনের তুলনায় কিছুটা

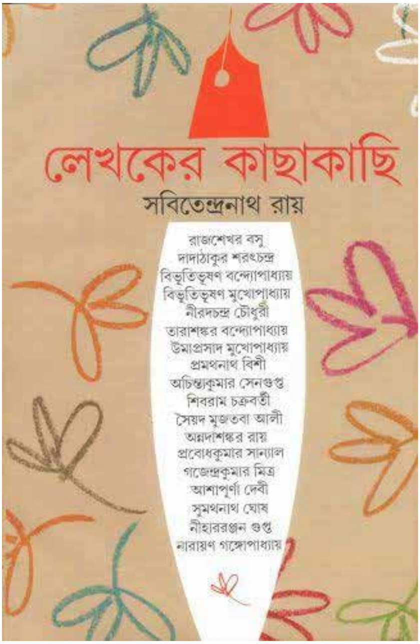

ডিসকাউন্ট দেওয়া হয়। তার থেকেও বড় আকর্ষণ, ওই দিন দোকানে এলে লেখকদের হাতের কাছে পাওয়া যায়। তাঁদের সঙ্গে কথা বলা যায়। তাঁদের দিয়ে বইয়ে সই করিয়ে নেওয়া যায়।

প্রশ্নঃ সেদিনের পয়লা বৈশাখ আর এদিনের পয়লা বৈশাখ। তফাতটা কোথায় ? সেই জৌলুস কি আর আছে?
ভানুবাবুঃ সবকিছুতেই তো জৌলুস কমছে। পয়লা বৈশাখের আড্ডাও তার ব্যতিক্রম নয়। এখনও আড্ডা হয়। এই সময়ের অনেক লেখক আসেন। কিন্তু সেই প্রাণটা যেন থাকে না। আসলে, এখন সবাই বড় ব্যস্ত। আগে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো সাহিত্যিক নতুন লেখকদের লেখা পড়তেন। উৎসাহ দিতেন। এখন সেই পড়ার আগ্রহ দেখি না। একজন আরেকজনের লেখা না পড়লে সেই একাত্মতা আসে না। সেই বর্ণময় চরিত্রও নেই। সেই আড্ডা দেওয়ার অবসরও নেই। আগে অনেক রাত পর্যন্ত আড্ডা হত। এখন তাড়াতাড়ি বন্ধ করে দিতে হয়।

প্রশ্নঃ এখনকার লেখকরা তাহলে পড়ছেন না !
ভানুবাবুঃ সবার সম্পর্কে এমনটা বলা হয়ত ঠিক হবে না। কিন্তু সার্বিকভাবে বলতে গেলে, পড়ার আগ্রহটা সত্যিই কমেছে। ভাল লেখা না পড়লে নিজের লেখাও সমৃদ্ধ হবে না। জীবনকে আরও গভীরভাবে দেখতে হয়। যে বিষয়টি নিয়ে লিখছেন, সেটি আরও ভালভাবে জানতে হয়। এই জানার চেষ্টাটাই অনেকের মধ্যে দেখি না। কিন্তু একজনের নাম বলতেই হবে, সমরেশ মজুমদার। ও কিন্তু কোনও বিষয়ে লেখার আগে সেটা ভালভাবে জেনে নেয়। অন্য কাউকে জিজ্ঞেস করতেও ওর কোনও সঙ্কোচ নেই। মাঝে মাঝেই ও ফোন করে অনেককিছু জানতে চায়। যেটা জানি, সেটা বলি। অন্যদের কাছেও জানতে চায়। কিন্তু এই অভ্যেসটা বাকিদের মধ্যে দেখি না। তারা হয়ত ভাবে, কিছু জানতে গেলে হয়ত ছোট হয়ে যাবে।

প্রশ্নঃ শুনেছি, প্রকাশকদের নাকি লেখকদের থেকেও অনেক বেশি পড়তে হয়।
ভানুবাবুঃ হ্যাঁ, লেখকদের না পড়লেও চলে। কিন্তু প্রকাশককে পড়তেই হয়। তার কোনও ফাঁকিবাজি চলবে না। বইয়ের পান্ডুলিপি পড়েই বুঝতে হয়, এই বই চলবে কিনা। চললে, কখন চলবে। শুধু লেখকের নামে তো বই কাটে না। ভাল বিষয়ও থাকতে হয়। আবার অনামী লেখকের ভাল বইও অনেক সময় মানুষের কাছে পৌঁছয় না।

প্রশ্নঃ এখন যদি কোনও লেখকের উপর বাজি ধরতে হয়, কার উপর ধরবেন ?

ভানুবাবুঃ প্রথমেই সমরেশ মজুমদার। লেখার একটা অদ্ভুত বাঁধুনি আছে। বিষয়টাকে ভালভাবে জেনে, তারপর লেখে। যা লেখে, সবাই বুঝতে পারে। এরপর নবনীতা দেবসেন। ওর লেখার মধ্যে অদ্ভুত একটা ভ্যারিয়েশন আছে। সব ধরনের লেখাই লিখতে পারে। আর এই সময়ের লেখকদের মধ্যে বেছে নেব প্রচেত গুপ্তকে। ওর গল্প বলার কায়দাটা ভারী অদ্ভুত। অনেক ছোটখাটো বিষয়কেও লেখার গুনে আকর্ষণীয় করে তুলতে পারে। এমন একটা আকর্ষণ আছে, যা আপনাকে শেষ পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাবে।

প্রশ্নঃ প্রকাশকের পাশাপাশি আপনি নিজেও তো একজন লেখক। কিন্তু লোকে বলে, অনেক দেরিতে কলম ধরলেন। এর জন্য আফসোস হয় না ?

ভানুবাবুঃ সে অর্থে আমি লেখক নই। আমি মূলত একজন প্রকাশক। লেখকদের সান্নিধ্যে এসে অনেক কিছু শিখেছি। দোকানে অনেক দিকপাল মানুষ আসতেন। কবিশেখর কালিদাস রায় বলেছিলেন, ‘এখানে যা আলোচনা হয়, তা লিখলেই একটা ভাল বই হয়ে যায়।’ কিন্তু আমি তো আর লেখক নই। তবু যে সব ঘটনা মনে দাগ কাটত, নোট করে রাখতাম। সেইসব স্মৃতি নিয়ে লিখেছিলাম ‘কলেজ স্ট্রিটে সত্তর বছর’। এটা আমার আত্মকথাই বলতে পারেন। এই বই পড়লে লেখকদের অনেক কথা জানতে পারবেন। পরে অনেকে বলল, বিভিন্ন লেখকদের সঙ্গে স্মৃতিকথা তুলে ধরতে। তখন লিখলাম, ‘লেখকের কাছাকাছি’।

প্রশ্নঃ কোন বই কেমন চলবে, আগাম বুঝতে পারেন ?

ভানুবাবুঃ হ্যাঁ, পারি। অভিজ্ঞতা থেকেই পারি। এর জন্য নিজেকে পাঠক হতে হয়, পাঠকের পালস বুঝতে হয়। কোনও বই হয়ত শুরুতে তেমন ছাপ ফেলে না। কিন্তু যত দিন যায়, কদর বাড়ে। সেটাও আগাম বুঝতে হয়। আবার কোনও বই শুরুতে দারুণ বিক্রি হলেও পরের দিকে থেমে যায়। পাঠকদের সঙ্গে কথা বলি। তাদের চাহিদা বোঝার চেষ্টা করি। সবমিলিয়ে একটা পালস বুঝতে পারি।

প্রশ্নঃ প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার হয়েও, এই বয়সেও নিজেই নাকি প্রুফ দেখেন।

ভানুবাবুঃ হ্যাঁ, তা দেখতে হয়। সব না হলেও কিছু তো দেখতেই হয়। লেখকরাও সবসময় প্রুফ দেখতে পারেন না। বড় লেখক হলেই নির্ভুল বানান লিখবেন, এমনটা সচরাচর হয় না। কাজটাকে ভালবাসি তো, তাই যত্ন নিয়েই করি। চেষ্টা করি, যতটা সম্ভব, নির্ভুল ছাপতে। কোথাও কোনও বানান ভুল থাকলে কষ্ট হয়। তাই, এই বয়সেও যতটা পারি, চেষ্টা করি।

(লেখাটি তিন বছর আগে পয়লা বৈশাখ বেঙ্গল টাইমসেই প্রকাশিত হয়েছিল। এই পয়লা বৈশাখ আবার ছাপা হল। সাক্ষাৎকারটি এখনও একইরকম প্রাসঙ্গিক। সাহিত্য ও প্রকাশনা জগতের অনেক অজানা তথ্য উঠে এসেছে এই সাক্ষাৎকারে।)

স্মৃতিটুকু থাক

আরণ্যকের সেই দোবরু পান্না

একবার হোলির সময় আমরা কয়েক-জন বন্ধু দল বেঁধে বেড়াতে গিয়েছিলাম গালুডি। ঘাটশিলা পেরিয়ে সেই গালুডি খুব সুন্দর জায়গা। কুলকুল করে বয়ে চলেছে সুবর্ণরেখা। নদীর পাড়েই মহুয়া খাচ্ছিল একদল আদিবাসী। আমাদেরও ইচ্ছে হল, একটু মহুয়া খাই।

একজন আদিবাসী কাকাকে বললাম, আমাদের একটু মহুয়া দেবে! সেই কাকা বলল, আপনারা খাবেন? আমি বললাম, কেন খাব না? কাকা বলল, আমার সঙ্গে আসুন। বলেই হনহন করে হাঁটতে শুরু করল। প্রায় দু কিলোমিটা-রের মতো পথ। সে বকবক করে গেল। মহুয়ার ঘোরে বলে যাচ্ছিল, হালকা চালের কথা, কিন্তু অধিকাংশ কথার মধ্যে এক গভীরতা লুকিয়েছিল। মনে হচ্ছিল, যেন এক দার্শনিকের সঙ্গে হাঁটছি। মনে মনে নামকরণ করে ফেললাম, দোবরু পান্না। হ্যাঁ, আরণ্যকের সেই দোবরু পান্না।

নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে আমাদের মহুয়া খাওয়াল। একটা বোতলে করে মহুয়া ভরেও দিল। টাকা দিতে গেলাম। কিছুতেই নিল না। বলল, আপনারা মহুয়া খেতে চেয়েছেন, এ তো আমার সৌভাগ্য, এর জন্য টাকা নেব কেন! সেই কাকার আসল নাম আর মনে নেই। কিন্তু হোলি এলেই আমাদের সেই দোবরু পান্নার কথা খুব মনে পড়ে।

দেবাশিস মণ্ডল, গড়িয়া

বেড়াতে গিয়ে বা অন্য কোথাও আপনি কি এমন কোনও মানুষের সন্ধান পেয়েছেন? লিখে পাঠাতে পারেন তাঁর কথা। লেখা পাঠানোর ঠিকানা

bengaltimes.in@gmail.com

স্মৃতিটুকু থাক

সেই মাধবকাকুরা হারিয়ে যাচ্ছে

আমার জন্ম, বেড়ে ওঠা মেদিনীপুরের এক মফস্‌সলে। আমাদের এলাকায় একজন পিওন এসেছিলেন। আমরা তাঁকে মাধবকাকু বলতাম। মাত্র কয়েক-দিনেই সবাইকে দিব্যি চিনে নিয়েছিলেন। কার কাছে কী ধরনের চিঠি আসে, কোন চিঠি কাকে দিতে হয়, ঠিক জানতেন।

একবার আমাকে খুব বড় একটা বিপদের হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন। এক বিয়ে-বাড়িতে একটি ছেলের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। কিন্তু সে যে এভাবে চিঠি লিখে ফেলবে, কে জানত! প্রেম নিবেদন করে মস্ত এক চিঠি পাঠিয়েছিল। ওই চিঠি যদি বাবার হাতে যেত, নির্ঘাত বকুনি জুটত।

মাধবকাকু সেই চিঠি বাবার হাতে দেননি। আমাকে দেখতে পেয়ে একদিন ডাকলেন। বললেন, ‘তিন দিন ধরে তোমাকে খুঁজছি। ইচ্ছে করেই বাড়িতে দিইনি। কোনও ভয় নেই। তোমার চিঠি আমি তোমাকেই দেব।’

এখন লোকে চিঠি লিখতেই ভুলে গেছে। মাধবকাকুদের মতো চরিত্ররাও বোধহয় হারিয়ে গেছে।

পিয়ালি সেনগুপ্ত, ভদ্রেশ্বর

(এই বিভাগ কিন্তু একান্তই পাঠকদের জন্য। আপনারাও লিখে পাঠান আপনাদের অনুভূতি। বিশেষ কারও কথা মনে পড়ছে? অতীতের কোনও কাজের জন্য ভুলস্বীকার করতে ইচ্ছে করছে? বলে ফেলুন। দেখুন, অনেক হালকা লাগবে। লেখা পাঠানোর ঠিকানা: bengaltimes.in@gmail.com)

চাঁদে গিয়েছিলেন! ইয়ার্কি হচ্ছে!

আবার নাকি চাঁদে লোক পাঠাচ্ছে নাসা। এবার আর একজন নয়, যাবেন চারজন। প্রায় চুয়ান্ন বছর আগে নাকি চাঁদে পৌঁছেছিলেন নিল আমস্ট্রং। ছোট থেকে ইতিহাসে আমরা সবাই এমনটাই পড়ে এসেছি। কিন্তু নন্দ ঘোষ বললেন, কভি নেহি। আমস্ট্রং মোটেই চাঁদে যাননি। এবার নন্দ ঘোষের কড়চায় একহাত নিলেন আমস্ট্রংবাবুকে।

নন্দ ঘোষের কড়চা

ছোট থেকেই মশাই ভুল ইতিহাস পড়ে আসছি। শুধু ইতিহাসই বা বলি কী করে? ভূগোল, বিজ্ঞান সব কিছুতেই গোঁজামিল। ছোট থেকেই শুনছি, নিল আমস্ট্রং নাকি চাঁদে গিয়েছিলেন। সঙ্গে নাকি ছিলেন এডুইন অলড্রিন। তখন ছোট ছিলাম, যে যা বুঝিয়েছে, তাই বুঝেছি। এখন বুঝি, কতবড় গাঁজাখুরি ব্যাপার মাথায় ঢোকানো হয়েছিল।

এখন বুঝি, পুরোটাই ভাঁওতা। একসঙ্গে অনেকের ওপর রাগ হচ্ছে। ব্যাটা নিল আমস্ট্রং, আমাদের চোখে হিরো ছিল। সে কিনা এত বড় একটা বুজরুকি করল? চাঁদে না গিয়েই বলে দিল চাঁদে গিয়েছি? একগুচ্ছ বানানো ছবি বাজারে ছেড়ে দিল?

ডন ব্র্যাডম্যানের কথা তো ছেড়েই দিলাম। সুনীল গাভাসকার, শচীন তেন্ডুলকাররাও একবার ২০০ করার পর আবার করেছে। তেনজিং নোরগে একবার এভারেস্টে যাওয়ার পর আরও একবার গিয়েছিল। তাঁর ছেলেও গিয়ে ঘুরে এসেছে। আমস্ট্রং ভাই আর গেলেন না কেন? ওই অভিযানের পরেও আরও অন্তত ৪০ বছর বেঁচেছিলেন। এমন একজন

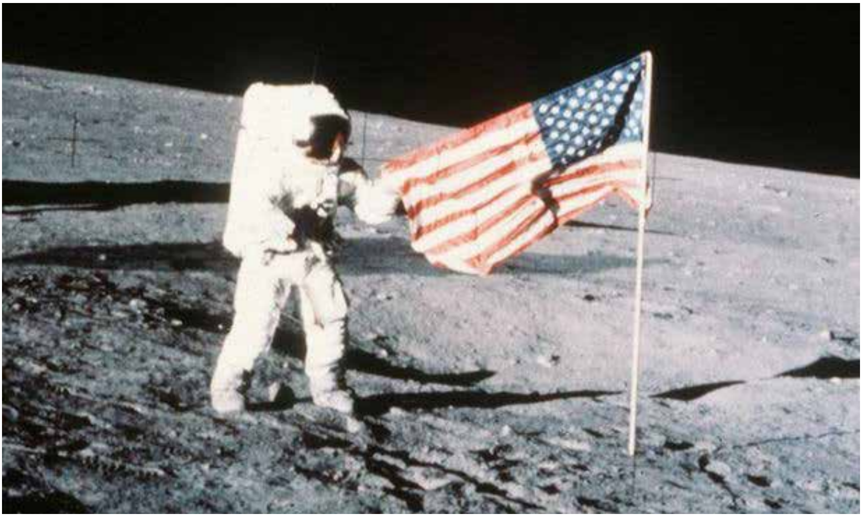

মানুষের তো কিংবদন্তি হয়ে ওঠার কথা। কই, তাঁকে নিয়ে আর তেমন মাতামাতি তো হয়নি। এমনকী মারা যাওয়ার পর সেই খবরটাও কাগজে প্রায় লুকিয়ে ছাপতে হয়েছে।

ব্যাটা আমেরিকা। তারাও প্রচার করে বেড়ালো, তারা নাকি চাঁদে লোক পাঠিয়েছে। গুলতানি মারার জায়গা পাওনি ? এতই যদি মুরোদ, তাহলে ১৯৬৯ এর পর থেকে আর পাঠাতে পারলে না কেন? পৃথিবী এত এগিয়ে গেল, বিজ্ঞান-প্রযুক্তি এত এগিয়ে গেল, কই আর তো পাঠাতে পারলে না? আরেকবার জো বাইডেনকে পাঠাও দেখি, তাহলে বুঝব তোমাদের মুরোদ কত।

নাসা। সে নাকি বিজ্ঞানের বাইবেল। সে ব্যাটারাও কিনা গুলবাজ! তখন থেকেই নাশা যেন নেশায় আক্রান্ত। গাঁজা খেয়ে কী সব তত্ব হাজির করেছিল। আমরা সব উজবুক। যেন কিছুই বুঝি না। যা, আরেকবার যা দেখি, তাহলে বুঝব। শুনছি, আবার নাকি ৪ জনকে পাঠানো হবে। আচ্ছা, নাসায় কি ইলেকশন হয়! নইলে, এমন প্রতিশ্রুতির বহর কেন? আগে পাঠা, তারপর বাতেলা দিবি?

আমাদের রাজ্যের সিপিএম। কথায় কথায় এত আমেরিকা বিরোধীতা করে। আর আমেরিকা যে এতবড় ধাপ্পা দিল, তার বেলা নীরব। ৩৪ বছর ধরে সিলেবাসে এসব সাজিয়ে রেখেছিলে কেন বাপু? এমনিতে এত রাশিয়ার কথা শোনো। এই ব্যাপারটায় রাশিয়া বা চীনের কথা শুনলে না কেন? কেন আমেরিকার সুরে সুর মেলালে?

সিপিএম অবশ্য মাঝে মাঝেই ভুল স্বীকার করে। এবার স্বীকার করুক, চাঁদে মানুষ পাঠানোর মার্কিনি বুজরুকি প্রচার করা ঐতিহাসিক ভুল ছিল।

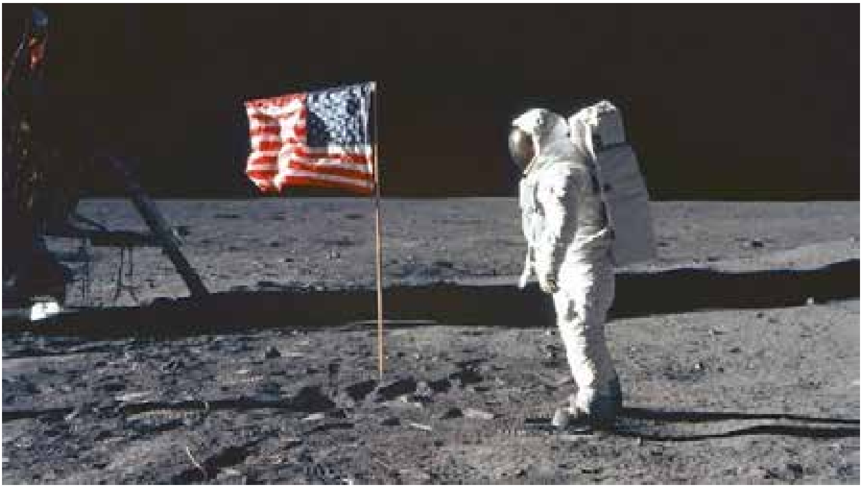

আর কেউ চাঁদে যেতে পারল না!

৫৩ বছর পেরিয়ে গেল। আর কেউ চাঁদে যেতে পারলেন না? নিল আমস্ট্রংরা কি সত্যিই চাঁদে গিয়েছিলেন? নাকি বানানো এক গল্প? স্রোতের বিপরীতে গিয়ে অন্য এক ব্যাখ্যা তুলে আনলেন শুভেন্দু মণ্ডল।।

আবার নাকি চাঁদে মানুষ যাবে। এবার আর দুজন নয়, একেবারে চারজন। নাসা নাকি এখন থেকেই উঠে পড়ে লেগেছে। কিন্তু ১৯৬৯ এ মানুষ চাঁদে গিয়েছিল বলে যে প্রচার, তা কতটা মিথ, কতটা মিথ্যে? এই নিয়ে নানা মত চালু আছে। একটা মার্কিন মত, একটা বাকি পৃথিবীর মত। ইন্টারনেট মারফত কিছুটা পড়াশোনা করা গেল। মনে হল, ভিন্নমতটাও তুলে ধরা জরুরি।

এত দিনের পুষে রাখা ধারণাগুলো কেমন যেন বদলে যাচ্ছে। আগে শুনতাম, ইউরেনাস,

নেপচুন, প্লুটো, এমনকি ভলকানোর কথা। এখন জানছি, ভলকানো তো দূরের কথা, প্লুটোও নাকি কোনও গ্রহ নয়।

ছোট বেলা থেকেই পড়ে আসছি, নিল আর্মস্ট্রং আর এডুইন অলড্রিন নাকি চাঁদে গিয়েছিলেন। ছোটবেলায় প্রচার ছিল রাকেশ শর্মাও নাকি চাঁদে গিয়েছিলেন। পরে জেনেছিলাম, চাঁদ নয়, আসলে তিনি মহাকাশে গিয়েছিলেন। কিন্তু নিল আর্মস্ট্রংরা কি সত্যিই চাঁদে গিয়েছিলেন? তাই নিয়েও সংশয় তৈরি হয়েছে। বেশ কয়েকটি প্রশ্ন মনের মধ্যে নাড়া দিচ্ছে। ইন্টারনেটে খোঁজখ-বর নিয়ে জানতে পারলাম, সারা বিশ্বেই এই প্রশ্নগুলো আছে। বিশ্বের অধিকাংশ দেশই নাকি আমেরিকার এই চাঁদে লোক পাঠানোর তত্ব মানতে পারেনি।

বিরুদ্ধ যুক্তিগুলো কিন্তু উড়িয়ে দেওয়ার মতো নয়। এক দুটো এখানে তুলে ধরা যাক।

১) চাঁদে তো হাওয়া নেই। তাহলে আমেরিকার পতাকাটা উড়ছে কী করে ?

২) সূর্য ছাড়া অন্য কোনও আলোর উৎস তো নেই। তাহলে ছায়াগুলি একে অন্যকে ছেদ করছে কেন ? দুজন দাঁড়িয়ে থাকলে ছায়া তো সমান্তরাল হওয়ার কথা।

৩) উষ্ণ বলয় ভেদ করে এত নিরাপদে চাঁদে পৌঁছে গেল?

৪) চাঁদ তো হাতের সামনে নয়। চোদ্দ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার দূরে। এতদূর একটা যান চলে গেল, ফিরেও এল? কত জ্বালানি লাগে? সেই জ্বালানি একটা যানে থাকা সম্ভব ?

৫) এতদিন অক্সিজেন ছাড়া থাকা যায়? কতগুলো অক্সিজেন সিলিন্ডার নিয়ে যেতে হয়েছিল ?

৬) এখন তো প্রযুক্তি আরও অনেক উন্নত। তাহলে এই ৫৪ বছরে আর কেউ যেতে পারল না কেন?

৭) রাশিয়া, জাপান, চিন তো চেষ্টা করতে পারত। তারা কেউ চেষ্টা করল না কেন?

৮) আমেরিকা আদৌ চাঁদে লোক পাঠিয়েছিল কিনা, তা নিয়ে যখন এত সংশয়, তখন সেই সংশয় ভেঙে দিতে আমেরিকাই বা আবার চন্দ্র অভিযান করল না কেন?

৯) চাঁদে তোলা কোনও ছবিতেই কোনও তারা দেখা যাচ্ছে না কেন?

১০) এত গুরুত্বপূর্ণ অভিযান। তার টেলিমেট্রি ডাটা কোথায়? নাসার যুক্তি, সেটা নাকি হারিয়ে গেছে? এটা কখনও বিশ্বাসযোগ্য? সারা পৃথিবীতে আলোড়ন তোলা অভিযানের নথি কেউ হারিয়ে ফেলে ?

১৪) উন্নত দেশগুলির অনেকেই চাঁদে যাওয়ার মার্কিন তত্ত্ব বিশ্বাস করেনি। তাদের দেশের ইতিহাস বা ভূগোল বইয়ে এই সংক্রান্ত কোনও কথা নেই।

১৫) নিল আমস্ট্রং মারা গেলেন এক দশক আগে- ২০১২ সালে। এত বছর বেঁচে থাকার পরেও তিনি সারা বিশ্বে সেই কিংবদন্তির মর্যাদা পাননি। এমনকি আমেরিকাও প্রথমদিকে তাঁকে নিয়ে লাফালাফি করলেও পরের দিকে বিষয়টা অনেকটা চেপে গিয়েছিল।

১১) শোনা যায়, এটি নাকি সুন্দরভাবে সাজানো একটি ভিডিও। কোনও এক মরু অঞ্চলে নাকি এর শুটিং হয়েছিল। পরিচালক ছিলেন হলিউডের বিখ্যাত পরিচালক স্ট্যানলি কুবরিক।

১২) বিল কেসিং। আমেরিকার রকেট প্রযুক্তির প্রবক্তা। তিনি ১৯৭৪ সালে একটি বই লেখেন। নির্যাস – আমেরিকার ৩০ বিলিয়ন ডলারের জোচ্চুরি। সেই বইয়ে তিনি পরিষ্কার উল্লেখ করেন, আমরা কখনই চাঁদে যাইনি। এটা বিশ্ব-বাসীর সঙ্গে একটা মস্তবড় প্রতারণা।

১৩) গাস গ্রিসাম নামে আরও এক নভোচারি ছিলেন। তিনি রহস্যনজকভাবে নিহত হন। অনেকে মনে করেন, তিনি এই প্রতারণার কথা জানিয়ে দিতেন। তাই তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এইসব নানা করণে প্রশ্ন উঠছে। আমাদের শিশুরা জানছে, চাঁদে মানুষ গিয়েছিল। কিন্তু এই যুক্তিগুলোও তো উড়িয়ে দেওয়ার মতো নয়। প্রশ্নহীন আনুগত্য নিয়ে আমরা সবকিছু কেন মেনে নিচ্ছি? আমার মনে হয়, খোলা মনে সবকিছু আরও নতুন করে ভাবা দরকার। ভারতীয় বিজ্ঞানীরা কী বলছেন, সেই ব্যাখ্যাও শোনা দরকার।

আমাদের সেই ফেলে আসা ছুটি ছুটি

অন্তরা চৌধুরি

কুট্টুস,

কেমন আছিস? চিঠি পেয়ে নিশ্চই অবাক হয়ে গেছিস। ভাবছিস জিওর ফ্রি ফোন, হোয়াটসঅ্যাপ থাকতে চিঠি কেন লিখছি। আসলে হাতে লেখা চিঠি একটা আলাদা ব্যাপার। বড় হলে বুঝবি। তোর স্কুলে নিশ্চই ছুটি পড়ে গেছে। তোরাই ভাল আছিস। কত্ত ছুটি তোদের। এইবয়সেই ছুটিটা উপভোগ করে নে। বড় হলে ছুটি হয়তো পাবি। কিন্তু সেই ছুটি বড় ক্লান্তিকর ছুটি।

তা এই তিনমাস কিভাবে ছুটি কাটাবি ঠিক করলি? তোদের অবশ্য এখন ছুটি কাটানোর উপাদানের অভাব নেই। টিভি তে অজস্র চ্যানেল, মোবাইল, ল্যাপটপ আরও কত কি! তবে কি জানিস আমাদের ছোটবেলায় ছুটি কাটানোর উপাদান বড় অল্প ছিল। আর অল্প ছিল বলেই সেই উপাদান বড় আনন্দের ছিল। এখন কোনও জিনিস চাওয়ার আগেই তোরা পেয়ে যাস। তাই সেই জিনিসটার গুরুত্ব তেমন থাকে না। ভাবছিস আবার তোকে জ্ঞান দিচ্ছি। না রে। তা নয়। সবাই বড় হয়ে গেলে তার নিজের ছোটবেলাকে মিস করে। নস্টালজিক হয়ে পড়ে। হয়তো তুইও একদিন তোর ছোটবেলাকে মিস করবি।

জানিস, আমাদের স্কুলে ছুটি পড়লেও পড়াশোনা থেকে আমাদের ছুটি ছিল না। তোদের তো আরওই নেই। তবে আমরা যখন পড়েছি তখন ইংরেজি স্কুলের রমরমা অত ছিল না। কাজেই আমরা বাংলা স্কুলেই পড়তাম। আর সেখানে এত পাহাড় প্রমাণ পড়ার চাপ ছিল না। মার্চে বার্ষিক পরীক্ষার রেজাল্ট বেরনোর পর এপ্রিল থেকে নতুন ক্লাস শুরু হত। আমাদের স্কুলে তখন ফ্যান ছিল না। গ্রীষ্মকালের সকাল বেলায় তাই বাইরেই ক্লাস হত। আমরা সবাই একটা করে আসন নিয়ে যেতাম। মাটিতে পেতে বসতাম। নতুন বই পেতাম। আমাদের বাংলা বইটার নাম ছিল কিশলয়। ভোরের সূর্যের মতো ওপরের কভারটা ছিল। আর তার চারপাশে সবুজ সবুজ পাতা। কেন জানি না ওই ভোরের প্রকৃতির সঙ্গে কিশলয় বইটার কোথাও অদৃশ্য মিল আছে।

যেই না স্কুলে ছুটির ঘণ্টা পড়ত, সেই আমরা তারস্বরে চ্যাঁচাতাম-ছুটি গরম গরম রুটি। ছুটির সঙ্গে রুটির যে কী সম্পর্ক তা আজও খুঁজে পাইনি। ছুটির দিনগুলোতে সকালবেলায় তাড়াতাড়ি স্নান সেরে রোজ একপাতা করে ইংরেজি আর বাংলা হাতের লেখা করে নিতাম। তখন প্রাইভেট টিউটর ছিল না। রোজ সন্ধেবেলায় মা পড়াত। সকালবেলায় মায়ের সব পড়া করে নিতাম। আর অপেক্ষা করতাম কখন দুপুর বারটা বাজবে। ভাবিছিস তো দুপুর বারটায় কী ছিল?

'দূরদর্শন' বলে টিভিতে একটা চ্যানেল আছে জানিস? না জানলেও অবশ্য দোষের নয়। এখন

আর কেই বা দূরদর্শন দেখে বল। টিভিতে এত অহস্র চ্যানেল। কত সিনেমা, কত গল্প। কিন্তু তখন ওই একটাই চ্যানেল ছিল। যাকে বলে সবে ধন বাবা নীলমণি। সকাল দিকটা ন্যাশনাল। আর দুপুর বারটা থেকে কলকাতা দূরদর্শন চ্যানেলটা খুলত। মুখোমুখি দুটো পাঁচকে রাখলে যেমন দেখতে হয় তেমন দেখতে একটা লোগো ঘুরতে ঘুরতে খুলত, আর অদ্ভুত মায়াবী একটা সুর বাজত। গ্রীষ্মের ছুটির সময়টা বারোটা থেকে শুরু হত ছোটদের জন্য অনুষ্ঠান ‘ছুটি ছুটি’। সেটা দেখার যে কি আনন্দ ছিল! ওই ছুটি ছুটি দেখব বলে আগে থেকে সব পড়া করে রাখতাম, যাতে কেউ না বকতে পারে। যে ঘরটায় টিভি থাকত সেই ঘরটা বেশ অন্ধকার করে টিভির সামনে বসে পড়তাম। এত আয়োজনের কারণ তখন ছুটি ছুটিতে ছোটদের সিনেমা দেখানো হত। তবে আধঘণ্টা করে হত বলে একটা সিনেমা একসপ্তাহ ধরে দেখানো হত। গুপীগাইন বাঘাবাইন, হীরক রাজার দেশে, সোনার কেল্লা আরো কত কী।

যেই শেষ হয়ে যেত, খুব খারাপ লাগত। বেশ টেনশনের মুহূর্তে শেষ হত। এরপর কী হবে সেটা নিয়ে সারাদিন ভাবো আর কি! যেই না গুপী আর বাঘা ‘শূণ্ডী’ বলে হাততালি দিয়েছে, ব্যাস্! কোত্থেকে হাসিমুখে শাশ্বতীদি চলে এসে বলত, –‘ছোট্ট বন্ধুরা, আজ তাহলে এই পর্যন্তই। আবার আগামিকাল ঠিক এইসময়ে তোমাদের সঙ্গে আবার দেখা হবে।’ খুব রাগ হত। পুরো সিনেমাটা দেখিয়ে দিলে কী ক্ষতি হত! এখন ভাবি জানিস, যে তখন কি পরিমাণে ধৈর্য্য দেখিয়েছি। জীবনে তখন সেই প্রথম সিনেমা দেখছি। ওই আধঘণ্টা যে কী দারুণ-ভাবে উপভোগ করতাম! সিনেমাটা দেখতাম বললে কম বলা হয়, বলা ভাল গিলতাম। আর ওই আধঘণ্টা ছুটি ছুটি দেখার জন্য সব পড়া করে নিতাম। সারাদিন ধরে কল্পনা করতাম পরেরদিন কী হবে।

কোথা দিয়ে যে দু মাস পেরিয়ে যেত। একটা গান আছে শুনেছিস, ‘আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম’। একদম সত্যি কথা। হঠাৎ করে চারপাশটা খুব তাড়াতাড়ি বড় হয়ে গেল। এখন ছোটদের জন্য কত কার্টুন চ্যানেল, আরও কতসব প্রোগ্রাম। সারাদিনই হচ্ছে। এখন বিনোদনটা এত সহজলভ্য বলেই তোদের কোনও অপেক্ষা নেই। আর কোনও জিনিসের জন্য অপেক্ষা না থাকলে তার মাধুর্যটাও বেশিদিন থাকে না।

অনেক ভারী ভারী কথা বলে ফেললাম। বাড়ির সবাই কেমন? তুই কি অঙ্ককে এখনও ভয় পাস? তাহলে একটা 7up খেয়ে নে। কিঁউকি ডরকে আগে জিৎ হ্যায়।

আচ্ছা, তোরা তো সব ইউটিউবেই দেখে নিস। একবার সার্চ মেরে দেখিস তো, ছুটি ছুটি মারলে কী দেখায়। নিশ্চয় সেই টাইটেল সঙটা পাবি। পুরনো দিনের কিছু ঝলকও পাবি। একটু অন্যভাবে ছুটি ছুটির আনন্দ নিয়ে দেখতে পারিস। আমাদের ফেলে আসা দিন কি তোর মনে সাড়া ফেলবে? জানি না। তবু একবার উকি দিয়ে দেখ।

পানশালার সেই হারিয়ে যাওয়া সন্ধে

সুপ্রিয় চ্যাটার্জি

মধ্য কলকাতার একটি পুরনো পানশালা। ভিতরে আক্ষরিক অর্থেই তিলধারণের জায়গা নেই। কোনও মতে স্বল্প আলোতেই সন্তর্পণে পানীয়ের গ্লাস, খাবারের প্লেট টেবিলে টেবিলে পৌঁছে দিচ্ছে দক্ষ পরি-বেশনকারীরা। রঙিন পানীয়ে শূন্য গেলাস পলকেই পূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। একধারে স্টেজ। সেখানে মাইক্রো-ফোন হাতে কিন্নরকণ্ঠে গাইছেন কোন সুবেশিনী যুবতী বা উচ্ছলকণ্ঠ গায়ক। যোগ্য সঙ্গতে পিছনে সারি দিয়ে বসে থাকা মিউজিশিয়ানেরা। 'তেরে বিনা জিন্দেগিসে কোই শিকওয়া', 'ইয়ে দিল তুম বিন' , 'আকাশ প্রদীপ জ্বলে' থেকে 'মনে পড়ে রুবি রায়' , 'রানার' থেকে শুরু করে 'পুরানো সেই দিনের কথা' , লতা, কিশোর, রফি, আশা, মান্না, হেমন্ত, শ্যামল, আরতি সন্ধ্যা, সবার গান একের পর এক গাওয়া হয়ে চলেছে, এমনকি রবীন্দ্রসঙ্গীতেরও ইতিউতি উপস্থিতি সেখানে।

সব মিলিয়ে মিনি ফাংশন। বাড়তি পাওনা বহু পুরনো অধুনালুপ্ত গান, যা শ্রোতার অভাবে আজকাল ফাংশনে আর খাওয়া হয় না। আর সুরা কয়েক পাত্র পান করার পর সেসব গান শোনার নস্টালজিক রোমান্টিকতা আর

তো কোথাও মাথা খুঁড়লেও মিলবে না।

নৌশাদ, ও পি নায়ার, শচীন কত্তা, সবার গান শুনতে চাইলে গাইবার কুশলীর অভাব নেই। ওয়ক্ত, পাকীজা, দোস্ত, তাজমহল পুরনো বিখ্যাত সব ছবির গানের ডালি।

লাইভ ব্যান্ড। চলতি কথায় সিঙ্গিং বার। বারে সুরাপান করতে গিয়ে সাথে বাড়তি পাওনা সংগীতলহরী। সন্ধ্যা হলেই উপচে পড়া ভিড়। চাকুরী জীবী, ব্যবসায়ী, উকিলবাবু, উঠতি মস্তান, জমির দালাল, কে নেই সেই ভিড়ে। কলকাতায় নৈশ আমোদ প্রমোদের তালিকায় উচ্চ মধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এই বিনোদন জায়গা করে নিয়েছে বিগত প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে।

মূলতঃ এই বারগুলি ছিল মধ্য কলকাতায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে। ডেকার্স লেনের পিঙ্করুম, মেট্রোপলিটন, চাঁদনী, ওয়াটার লু স্ট্রিটের রক্স, চেরিফিক, আর হান থাই, বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটের মনসুখ, সি আর এভিনিউয়ে ক্যালকাটা কাফে, ডিউক, চাঁদনী চকে ম্যাজেস্টিক, নিউমার্কেট এলাকায় রক্সি, প্যারিস, প্রিন্সেস, রফি আহমেদ কিদোয়াই রোডে গালিব, এসব জায়গায় মূলত বাংলা, হিন্দি গান হত। ইংরেজি গান হত পার্ক স্ট্রিট এলাকায়।

যাচ্ছে দ্রুত। শ্রোতার আসনে নতুন প্রজ-ন্ম, অসামাজিক নানান চরিত্র। তাদের পরিব-র্তিত চাহিদার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে না পেরে বিদায় নিয়েছে একে একে সুকন্ঠ শিল্পীরা, তাদের জায়গায় এসেছে চটুল নৃত্যপটু কিশোরী ও

বেশ কয়েকজন প্রতিষ্ঠিত গায়ক গায়িকা একসময় এই বার গুলোতে গান করে গিয়েছেন। উষা আয়ার (তখনও উত্থুপ হননি) পার্ক স্ট্রিটের একটি রেস্তোরাঁয় গেয়ে গিয়েছেন। মহম্মদ আজিজ (মুন্না) গান গাইতেন গালিব বারে।

তবে প্রদীপের নীচের অন্ধকারের কাহিনীও আছে। প্রথা অনুযায়ী, গায়িকার কন্ঠের প্রতি অনুরাগ অনেক ক্ষেত্রেই সুরার সাহচর্যে শ্রোতার মনকে কাঁচপোকার মতো টেনে নিয়ে গিয়েছে মোহের আবেশে, গান শুনে কিছু পারিতোষিক দেওয়ার সীমা ছাড়িয়ে বহু অর্থের অপচয়ের আঁধারে। মোহ যখন কেটেছে, আর ফেরা হয়ে ওঠেনি স্বাচ্ছল্যের দিনে। আগের সোনালী দিনগুলি হারিয়ে

যুবতীরা, মিউজিশিয়ানদের জায়গায় ল্যাপটপে ট্র্যাকে হালফিলের লাউড মিউজিক, সাইকোডেলিক আলো, অর্থের স্রোত উপচে পড়ে পানশালার মেঝেতে।

মধ্য কলকাতার এলাকা ছাড়িয়ে সিঙ্গিং বার (বর্তমানের চলতি নাম ড্যান্সবার) ছড়িয়েছে গোটা কল-কাতায়, পশ্চিমবঙ্গের প্রায় প্রতিটি জেলার শহর ও শহরতলিতে। বহু মানুষের জীবিকা যেমন চলে তেমনি প্রশাসনের স্থায়ী মাথাব্যথার কারণ এই হঠাৎ গজিয়ে ওঠা প্রমোদ কাননগুলি। সংখ্যায় বেড়েছে অবশ্যই। সুখে বেড়েছে কি না জানি না। তবে মন বলে, ‘বাঁশি বুঝি সেই সুরে আর বাজবে না…’।

Sundarban Residency
এবার শীতে সুন্দরবন
2N / 3D Special Package
বিশেষ ছাড়
★ Godkhali to Godkhali
1800 103 9161
sundarbanresidency.com

শারদ শুভেচ্ছা
Mahfil
Healthy 'n' Tasty Mahfil The Best Tea
WANTED URGENTLY
Area Wise Financially Sound
Distributors and Professionals
9830201142, 8335044913
Brand Owned By : SACKS BEE
14/20, Uday Sankar Sarani, Kolkata - 700 033
AN ISO 22000 : 2018 & CODEX GMP Certified Company
Packed at : Gobindapur, Benepukur, Mahestala, BBT Road, Kolkata-700 141
Email : sacksombee@gmail.com ● website : www.sacksbee.com

খোলা চিঠি

বেঙ্গল টাইমসের জনপ্রিয় একটি বিভাগ— খোলা চিঠি। একটা সময় নিয়মিত প্রকাশিত হত। নানা জগতের দিকপালদের লেখা হত এই খোলা চিঠি। কোনওটা অভিনন্দনের, কোনওটা তীব্র সমালোচনার। লিখতেন দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে থাকা পাঠকরা।

মাঝে কিছুটা অনিয়মিত হয়ে পড়েছিল। ই ম্যাগাজিনে আবার সেই খোলা চিঠিকে স্বমহিমায় ফিরিয়ে আনা হচ্ছে। চেষ্টা থাকবে প্রতি সংখ্যায় অন্তত একটি করে খোলা চিঠি প্রকাশ করার। এই চিঠি মূলত সাম্প্রতিক ঘটনা বা ইস্যুকে নিয়েই। রাজনীতি, সাহিত্য, খেলা, বিনোদন-সহ যে কোনও জগতের মানুষকেই লেখা যেতে পারে এই খোলা চিঠি। লিখবেন আপনারা।

লেখার শব্দ সংখ্যা আনুমানিক ৫০০ থেকে ৮০০।

পিডিএফ নয়, ইউনিকোডে পাঠান।

নির্বাচিত কিছু চিঠি নিয়ে আলাদা সংখ্যাও হতে পারে।

লিখে ফেলুন। পাঠিয়ে দিন বেঙ্গল টাইমসের ঠিকানায়।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা:
bengaltimes.in@gmail.com

মিডিয়া সমাচার

এক মিডিয়ার কথা অন্য মিডিয়ায় সচরাচর আলোচনা হয় না। কিন্তু বেঙ্গল টাইমসে বেশ কয়েকবছর ধরেই মিডিয়া জগতের নানা অজানা দিক উঠে আসে।

একজন অভিনেতা বা খেলোয়াড় বা সাহিত্যিক যদি পারফর্মার হয়ে থাকেন, তবে একজন সাংবাদিকও পারফর্মার। কোনও রাজনৈতিক দল বা কোনও ক্লাব নিয়ে যদি আলোচনা হয়, তাহলে কাগজ বা চ্যানেলও একটি প্রতিষ্ঠান। তাদের নিয়েও আলোচনা হতে পারে। প্রাণ খুলে প্রশংসাও করতে পারেন। আবার ভাল না লাগলে সমালোচনাও করতে পারেন।

মিডিয়া মানে এখন আর শুধু কাগজ বা টিভি চ্যানেল নয়। গণমাধ্যমের সুবিশাল পরিসরে সোশ্যাল মিডিয়াও ঢুকে পড়েছে।

কোনও চ্যানেলের দারুণ কোনও অনুষ্ঠান নিয়ে আলোকতপাত হতে পারে। কোনও ভাল ইউটিউব চ্যানেল ও তার কনটেন্ট নিয়েও আলোকপাত হতে পারে। ফেসবুকের কোনও ভাল গ্রুপ নিয়েও চর্চা চলতে পারে। আপনার অভিজ্ঞতা অন্যদের মধ্যে ভাগ করে নিতেই পারেন।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা:
bengaltimes.in@gmail.com

গল্প

স্বপ্ন মেদুর

কুমকুম বসু দাস

পাঁচটা বেজে পঁচিশ। হাত ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে অস্থির হয়ে ওঠে আলাপ। এখনও পঁয়ত্রিশ মিনিট। ছ'টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে নেমে আসে ও। তবুও মনে হয়, দেরি হয়ে গেল। আসলে ঘড়িটা একটু এগিয়েই রাখে আলাপ। কারণ, সুলগ্না কখনই ছ'টা বেজে পাঁচ–সাত মিনিটের বেশি দেরি করে না। ভয় থাকে সুলগ্না কখন ওর চারতলার ঘর থেকে বেরিয়ে পড়বে - আরও দুতলা উঁচু অর্থাৎ ছ'তলার ঘরে বসে আলাপ তা টেরই পাবে না। ফেরার সময় ভীষণ তাড়া থাকে সুলগ্নার। কী একটা নাকি গ্যালপিন ট্রেন আছে - সুলগ্নাদের ওখানেই প্রথম স্টপ। তাই ওই ট্রেনটা ও মিস করে না কিছুতেই।

এক এক সময় রাগ হয় আলাপের। কী দরকার ওর চাকরি করার। বাবা-মার একমাত্র মেয়ে। বাবা সি ই এস সি–র চিফ্ ইঞ্জিনিয়ার। ভাই কেমেষ্ট্রিতে মাস্টার্স করে পি এইচ ডি করছে। কী দরকার এত পরিশ্রমের চাকরির। বাড়িতে থাকলে তুমি আরও সুন্দর হতে। তোমার পাতায় ঘেরা গভীর চোখ দুটোর নীচে একটুও কালি জমত না।

এসব কি ভাবছে আলাপ! এখনও তো ওকে আর পাঁচজনের মতো 'মিস্ দাশগুপ্ত', 'আপনি' বলেই ডাকে আলাপ। তবে হ্যাঁ, প্রশ্নটা ওকে করেছিল। সুলগ্না বলেছিল, 'কেন? ভাল পোস্ট, মনের মতো স্যালারি। শুধু শুধু বাড়ি বসে কী করব বলুন।'

সত্যি তো। এত অবুঝ আলাপ। যদি সুলগ্না দাশগুপ্ত নামের এই মিষ্টি মেয়েটি এই ফার্মে চাকরি না নিত, তবে তাকে কোথায় পেত আলাপ সেন! না, তবে সুলগ্না কি চিরকাল

চাকরি করবে। না, তার কখনই করতে দেবে না আলাপ!

***

আজ দুটি বছর ধরে স্বপ্নের জাল বুনে চলেছে আলাপ। স্নিগ্ধ গাম্ভীর্য্যের আবরণে অন্য সকলের মতো আলাপের কাছেও নিজেকে আড়াল করে রেখেছে সুলগ্না। তাতে আলাপ দমে যায়নি। বরং কালচার্ড ফ্যামিলির সুন্দরী শিক্ষিতা মেয়ে পুরুষের সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করতে এসেছে বলেই যে প্রগল্ভা হবে, তা চায় না আলাপ। কিন্তু ভালোবাসা অন্তর্যামী। সুলগ্না ওর মন বোঝে না এমন হতেই পারে না। বাড়ি ফেরার পথে বাসের পনেরো মিনিটের সান্নিধ্যে সুলগ্না হাসে, কথা বলে। মনে মনে তখন অনেক বেশি পায় আলাপ। সেই সেদিন

- ভীষণ বৃষ্টিতে ট্রাম নেই, বাস নেই, কোনও-মতে হাঁটতে হাঁটতে আসছিল সুলগ্না। আলাপ সারাটা পথ ওর সঙ্গে ছিল। জলে কাদায় সুলগ্নার শাড়ির অনেকটা অংশ ভিজে গিয়েছিল। ওর ফর্সা ভিজে গোড়ালিটা রুমাল দিয়ে মুছিয়ে দিতে ইচ্ছে হয়েছিল আলাপের। তবুও একদিন কার যেন মৃত্যুর জন্য আগে আগে অফিস ছুটি হল। বাসে সুলগ্নার পাশে একই সিটে বসেছিল আলাপ। বাসের ঝাকুনিতে সুলগ্নার মৃদু ছোঁয়া লাগছিল আলাপের গায়ে। রোমাঞ্চিত আলাপ এখনও অনুভব করে সেই মুহূর্তটা।

****

সুলগ্না - সুলগ্না - তোমাকে নিয়ে কতদিন চলে গেছি মাঠ পেরিয়ে - ছোট্ট নদী ডিঙিয়ে। তোমার কোমর ছাপানো চুলের গোছা বাতাসে এলোমেলো। আমার হাতে হাত রেখে তুমি ভেসে ভেসে চলেছো। এমন সময় বৃষ্টি এল ঘনিয়ে। বাতাসে জলের গন্ধ। নাম না জানা নদীর ধারের শিমূল গাছের তলায় ডানা ভেজা পাখির মতো থামলে তুমি। আকাশে মেঘ যেমন বৃষ্টি হয়ে ধরা দিল মাটির বুকে, আমার কাছে তেমনি ধরা দিলে তুমি!

'কীরে, বেরোবি না আজ?' সৃজনের ডাকে চমকে ওঠে আলাপ। নিশ্চয় চলে গেছে সুলগ্না। শিয়ালদা রুটের বাস অনেকগুলো আছে। নিশ্চয় রাগ করে তার একটাতে চলে গেছে। যাবার আগে ওর আয়ত চোখ দুটো বার বার তাকিয়েছে দশতলা বিল্ডিংটার ছ'তলায়। ওর টিকলো নাকের দুপাশে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে। অনেকগুলো বাস ছেড়ে তারপর আশপাশের কৌতুহলী দৃষ্টি এড়াতে বাসে উঠেছে। 'কি মিঃ সেন, কাজের চাপ ছিল বুঝি আজ?' এ কি, সুলগ্না তবে যায়নি! আলাপের জন্য দাড়িয়ে আছে! মৃদু হেসে আলাপ বলে- 'না, মানে - আপনি বাস পাননি?' সুলগ্না লাজুক মুখে বলে, 'আপনার জন্য অপেক্ষা করছিলাম।'

আলাপ ঠিক শুনছে তো! সুলগ্না আলাপের জন্য অপেক্ষা করছিল! সুলগ্না, আমি জানতাম, আমার প্রতীক্ষা মিথ্যে হবে না। সুলগ্না, সেই কত দিন ধরে, লক্ষ কোটি বছর ধরে...... সৃষ্টির মুখে যেদিন প্রথম কথা জেগেছিল - জলের ভাষায় - হাওয়ার কণ্ঠে - সেই আদি যুগ থেকে আমি অপেক্ষা করে আছি তোমার জন্য।

'মিঃ সেন, আগামী রবিবার আমাদের বাড়িতে আপনার নিমন্ত্রণ। কাল আমি আসছি না। পরশু সেকেন্ড স্যাটারডে। সময় পাব না আর।

আমি স্টেশনে লোক পাঠাব। আপনার কোনও অসুবিধে হবে না।' বলতে বলতে এক টুকরো কাগজে সব লিখে বুঝিয়ে দিল সুলগ্না। তারপর অভিভূত আলাপের খেয়াল নেই কখন সম্মতি জানিয়েছে, একসঙ্গে বাসে উঠেছে এবং নির্দিষ্ট ষ্টপেজে নেমেছে।

****

এরপর এসেছে সেই প্রতীক্ষিত দিনটি। স্বপ্নে স্বপ্নে বিভোর হয়ে পার হয়েছে কটা স্টেশন। তারপর উৎকণ্ঠিত হয়ত বা একটু নার্ভাস আলাপ নেমেছে শ্যামনগরে। আচ্ছা, সেদিন তো সুলগ্নাকে জিজ্ঞাসা করা হল না, কী উপলক্ষে যেতে বলেছে ও। তবে কি সুলগ্নার জন্মদিন। কোনও উপহার আনা হল না তো!

'একসকিউজ মি, আপনি কি মিস্টার আলাপ সেন?' সুদর্শন এক তরুণের প্রশ্নে চমক ভাঙে আলাপের। 'হ্যাঁ----'। 'সুলগ্না আমার দিদি। আপনাকে নিতে এসেছি।' স্টেশন থেকে বাড়ি পর্যন্ত পথটুকুর মধ্যেই যথেষ্ট ভাব জমে উঠেছিল সুলগ্নার ভাইয়ের সঙ্গে। খুব মিশুকে ছেলে। স্বল্প ভাষিনী সুলগ্নার ভাই বলে মনেই হয় না। শুধু ও নয়। সুলগ্নার বাবা–মাও সমান আন্তরিক। কথায় গল্পে অল্প সময়ের মধ্যেই নিজের করে নিয়েছিলেন আলাপকে।

ছোট্ট সুন্দর বাড়িটা বেশ ছিমছাম - যেন কোনও নিখুঁত শিল্পীর হাতে সাজানো। ব্যালকনিতে বসলে দেখা যায় চারিদিকে জানা–অজানা গাছের সমারোহ। সুলগ্না, আমাদের ঘরটাও হবে ঠিক এমনই সবুজের মাঝখানে। জনারণ্য থেকে অনেক দূরে। তোমার হালকা রঙের শাড়ির ঘোমটা সরিয়ে একরাশ ঘন মেঘের মতো চুলে মুখ ডুবিয়ে বলব---।

একি! সুলগ্না কাঁদছে? টেবিলের উপর রাখা ওই ফটোতে মালা পরিয়ে - ধূপ জ্বালিয়ে - ওই প্রশান্ত মুখখানির দিকে তাকিয়ে কেন কাঁদছে সুলগ্না? 'মিঃ সেন, কেন কাঁদছি! আজ তিন বছর ধরে প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে আমি কাঁদছি। যার ফটো দেখছেন - আজ থেকে চারবছর আগে ঠিক এই দিনটিতে আমরা এক হয়ে ছিলাম। তারপর শুধু একটি বছর। অ্যাক্সিডেন্ট। মোটর দুর্ঘটনা ছিনিয়ে নিল ওকে আমার কাছ থেকে। একটু এগিয়ে বিছানায় শোয়া ছোট্ট এক শিশুকে বুকে তুলে নিল সুলগ্না। আদরে আদরে অস্থির করে তুলল ঘুমন্ত শিশুকে। 'মিঃ সেন, এই আমাদের ছেলে। শুধু ওর মুখ চেয়ে এই বিষাক্ত জীবনটা ধরে রাখতে হল। একি, আপনার চোখে জল কেন? আমি বিধবা বলে? কে বলেছে - দেখছেন না - আমি ভাল ভাল শাড়ি, গয়না পরি। প্রসাধন করি। আমার স্বামী প্রতিমুহূর্তে আমার সঙ্গে আছেন। সকলে আড়ালে কথা বলে। কিন্তু আমি সুন্দর হয়ে থাকি। ও যে তাই চাইত।' একটা যন্ত্রণা চেপে আবার বলল - 'ওর পছন্দটুকু আজও ধরে রেখে আমি কি অন্যায় করেছি! মিঃ সেন, আমি দুঃখী, কাউকে সুখী করার অধিকার আমার নেই।'

ফেরার ট্রেনে আলাপ স্থানুর মতো বসেছিল। কিছু কথা বুক ঠেলে উঠে আসছে। 'সুলগ্না, আমার ভালোবাসাকে তুমি চিনেছিলে বলেই আজ কাছে ডেকে এমনি করে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিলে। তাই আজ আরও অনেক বেশি সুন্দর তুমি! কত যে সুন্দর, তা তুমি নিজেও জানো না।'

শান্ত গ্রাম বারমিক

কুয়াশাঘেরা জোড়পোখরি

রুমা ব্যানার্জি

শহুরে একঘেয়েমিতে ক্লান্তজীবন যখন প্রাণ ভরে নিশ্বাস নিতে চায়, তখন মন ছুটে যায় নীল সবুজ হিমালয়ের কোলে কোনও অজানা গ্রামে। সেখানকার সোঁদা মাটির গন্ধ, ঝোপে ঝাড়ে ঝিঁঝি পোকার ডাক, হোমস্টের রান্নাঘর থেকে নেপালি সুরে গুনগুন, দূরে পাহাড়ের গায়ে জ্বলে থাকা টিমটিমে আলো — সব যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছিল। কিছুটা নিমরাজি কর্তাকে বাগে পেয়ে বললেই ফেললাম, চলো কদিন পাহাড়ে ঘুরে আসি। হাতে বেশিদিন ছুটি নেই, বড়জোর চার- পাঁচ দিন। তাই বা মন্দ কী? কর্তা রাজি, শুধু শর্ত একটাই, দার্জিলিঙে থাকা চলবে না। অগত্যা তাতেই রাজি।

আগে থেকে তেমন প্ল্যান ছিল না। তাই বন্ধুর শরণাপন্ন হলাম। সে ফোন করে একটা মনের

মতো হোমস্টেও খুঁজে দিল, শহর থেকে দূরে, যেমনটি চাইছিলাম। বারমিক, কালিম্পং এর কাছে একটা নির্জন গ্রামে। গাড়িও ঠিক হল। এন জে পি থেকে তুলে নেবে। চালাও পানসি বেলঘরিয়া!

ভোরবেলায় দার্জিলিং মেল থেকে নেমে বাক্স পেঁটরা নিয়ে চড়ে বসলাম নির্দিষ্ট গাড়িতে। শহর ছাড়িয়ে একটু প্রাতরাশ, তার পর সেবক রোড ধরে সোজা বেঙ্গল সাফারি। আমার বন্য জীবজন্তু দেখার দৌড় চিড়িয়াখানা পর্যন্ত। খোলা পরিবেশে, সতর্ক পাহারায় দক্ষিণরায়কে দেখা এই প্রথম, তাও একহাত দূরত্বে। বানর, হাতি, হরিণ, ভাল্লুক, ময়ূর সব দেখার পরে দর্শন দিলেন স্বয়ং দক্ষিণরায়। অলস পায়ে, ঘাড় ঘুড়িয়ে, তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে তাকাতে তাকাতে হেঁটে চলে গেলেন সামনে দিয়ে। মন বলল, মহারাজা তোমাকে সেলাম।

সন্ধ্যা নামার মুখে পৌঁছে গেলাম বারমিক, পাহাড়ের ঢালে একটা ছোট্ট গ্রাম। ছড়ানো–ছেটানো কিছু বাড়ি। কালিম্পং থেকে রংপো যাওয়ার যে পাকা রাস্তা গ্রাম চিরে চলে গেছে, তার ধারে গোটা চার–পাঁচ দোকান। নিচে, অনেকটা নিচে খানিকটা সমানমতো জায়গায় একটা খেলার মাঠ। পাশে একটা প্রাথমিক বিদ্যালয় আরেকটা ঝরনা আছে গ্রামের গা–ঘেঁষে। অনেকখানি পাহাড়ের ওপর থেকে নিচে একটা চওড়া পাথরের ওপর পড়ছে। সেখান থেকে প্লাস্টিকের বোতলে বা জারিকেনে ভরে জল আনে গ্রামের লোকেরা। সেটাই বলতে গেলে বারমিকের খাওয়ার জল। বাকিটা বৃষ্টির জল ধরে রেখে। পর্যটক এলে জলের গাড়ি বুক করতে হয়। পথচলতি ড্রাইভাররা অনেক সময় গাড়ি দাঁড় করিয়ে ঝরনা থেকে তাদের বোতলে জল ভরে নেয়। এসব নিয়েই এই গ্রাম। মালিক বেশ

আন্তরিকভাবে হাসি মুখে আমাদের স্বাগত জানালেন। ছোট্ট ছিম ছাম অথচ আধুনিক ব্যবস্থাযুক্ত বাড়ি। বারান্দায় দাঁড়িয়ে যতদূরে চোখ যায়, শুধু সবুজ। মালকিনের হাতের রান্না সব ক্লান্তি ভুলিয়ে দিল। সেদিন তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লাম। কারণ, পরের দিন কালিম্পং যাব।

কালিম্পং তিস্তা নদীর ধারে একটি শৈলশিরার উপর অবস্থিত। এমনিতে শহরটা বেশ ঘিঞ্জি। তবে দর্শনীয় স্থান অনেক। শহরের কাছেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতি বিজড়িত গৌরীপুর হাউজ। কালিম্পংয়ের আরেক দ্রষ্টব্য লেপচা মিউজিয়াম। এই শহরে বেশ কয়েকটি বৌদ্ধ মঠ, চার্চ অতিমারির কারণে বন্ধ। বিখ্যাত মর্গ্যান সাহেবের বাংলো সেটাও বন্ধ। আসলে, যাদের বুকিং থাকে, শুধু তাদের জন্যই খোলা। সামনেই একটা মিলিটারি ক্যান্টনমেন্ট। সেখানে ক্যাফেটোরিয়ায় বসলেই মন জুড়িয়ে যায়। যতদূর চোখ যাবে, গলফ কোর্স। এখানে কত যে সিনেমার শুটিং হয়েছে! এই মর্গ্যান হাউসেরও একটা ঐতিহ্য আছে। হন্টেজ হাউস খুঁজলেই একেবারে শুরুতে এসে যায় এই বাংলোর নাম। সাহেবি আমলের বাংলো। এখন পর্যটন দপ্তরের অধীনে। ভেতরটা নাকি অত্যাধুনিক, কিন্তু বাইরে দিকের আদলটা ইচ্ছে করেই ভুতুড়ে রাখা হয়েছে। কাছেই দূরপিন মনেস্ট্রি। ওখানে গেলেই মনে অদ্ভুত একটা প্রশান্তি আসে। দারুণ একটা ভিউ পয়েন্ট রয়েছে।

ক্যাকটাসের মনোমুগ্ধকর সংগ্রহ দেখতে গেলাম, পাইন ভিউ নার্সারিতে। এছাড়া হনুমান পার্ক, দুর্গামন্দির, কালীমাতা মন্দির প্রভৃতি জায়গা দেখার মতো। তিস্তা বাজারে মংপুর রেস্টুরেন্টে খেয়ে পেট মন দুটোই ভরল। এখনও মোমোর সুবাস পাচ্ছি যেন।

পরেরদিন দার্জিলিং, আমার স্বপ্নের শহর, দার্জিলিং। নীল আকাশের নীচে পাহাড়ের গায়ে ধূসর মেঘেদের আনাগোনা, সবুজ উপত্যকার গায়ে ছোট ছোট কাঠের বাড়ি, আর পাইন, দেবদারুর সাথে রডোড্রেনড্রন,

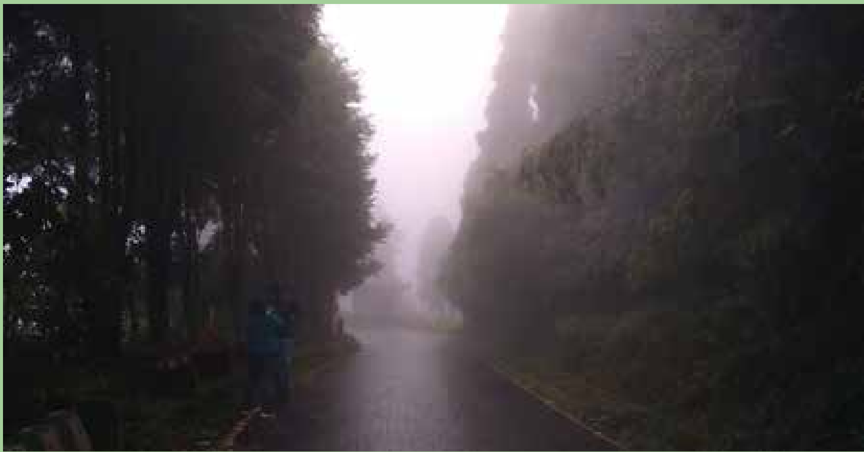

ক্যামেলিয়ার মেলবন্ধন ভ্রমণপ্রেমীদের বার বার টেনে নিয়ে যায় দার্জিলিং। মেঘ–কুয়া-শার লুকোচুরিতে ব্যস্ত শহরের পাশ দিয়ে চলে যায় টয় ট্রেন। পাইনের অন্ধকার মাখা পিস প্যাগোডা যাওয়ার রাস্তা আমাকে বড্ড আর্ক-ষণ করে। ভিউ পয়েন্টের রেলিংয়ে দাঁড়িয়ে বারবার হারিয়ে যেতে ইচ্ছে করে কুয়াশায়, মেঘেদের ভিড়ে। গ্লেনারিজ আর ম্যাল ঘুরে তীর্থ করার আনন্দ নিয়ে রওনা হলাম। শর্ত অনুযায়ী দার্জিলিংয়ে থাকা হবে না। সুতরাং ঠিক হল থাকব কিছুটা দূরে, জোড় পোখরিতে।

জোড় পোখরি, হিমালয়ের কোলে পাইন আর ধুপি গাছের জঙ্গলে ঘেরা, কুয়াশা মাখা একটা ছোট্ট জায়গা প্রায় ৭৬০০ ফুট ওপরে, সেঞ্চল অভয়ারণ্যের একটা অংশ। এখন একদিকে কাঞ্চনজঙ্ঘা যেন হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যাবে এমন। অন্যদিকে কার্শিয়াং আর দার্জিলিং।

দার্জিলিং ঘুরে রওনা হলাম জোর পোখরির উদেশ্যে। চড়াই উতরাই পেরিয়ে মাত্র ১৯ কিমি রাস্তা। সান্দাকফু যাওয়ার জন্য মানেভঞ্জন বা চিত্রের দিকে না গিয়ে ধরলাম সুখিয়া পোখরির পথ। শুনশান রাস্তা, পাইন গাছের পাতা ঘেঁসে হওয়ায় বাজছে এক নৈসর্গিক সুর, দিনের শেষ তাই পাখির কূজনে পাহাড় থেকে পাহাড়ে ছড়িয়ে পড়ছে মায়াবী সুরের ঝর্না, পথে রয়েছে কংক্রিটের তৈরি বেঞ্চ যেখানে বসে এই আনন্দ উপভোগ করা যায়।

সন্ধ্যা নামছিল পাইনের পাতা বেয়ে। কুয়াশা আর মেঘ চপল কিশোরীর মতো পথের আঁকে বাঁকে খেলা করছে দল বেঁধে। কান পাতলেন শোনা যায়, গাছ থেকে টুপ টাপ করে ঝরছে জলের ফোঁটা। আমাদের ড্রাইভার জানালো সামনেই একটা গোরস্থান, সব মিলিয়ে একটা গা শিরশিরে অনুভূতি ঘিরে ধরল।
যতক্ষণে আমরা হোমস্টেতে পৌঁছোলাম, ততক্ষণে সন্ধ্যা নেমেছে। যদিও ঘড়িতে সময় সাড়ে পাঁচটা। দূরে কার্শিয়াং শহর জুড়ে আলো জ্বলছে। এমনকী বাগডোগরার আলো পর্যন্ত দেখা গেল।

হাতে গরম ধোঁয়া ওঠা চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে যেন হারিয়ে যাচ্ছিলাম স্বপ্নের রূপকথার রাজ্যে। সব যেন ঘুমিয়ে আছে রুপোর কাঠির ছোঁয়ায়। যদিও ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমি নেই, তবে শুনলাম ওখানে হিমালয়ের স্যালামান্ডার দেখা যায়। যার আঞ্চলিক নাম গোড়া এবং বেশ কিছু বছর আগে ভাল্লুক দেখা গেলেও এখন আর তেমন বন্যপ্রাণী দেখা যায় না। নিশ্চিন্তে ঘরে ঢুকে পড়লাম।

সুন্দর সাজানো গোছানো ঘর, বড় বড় জানালার পর্দা সরালেই সামনেই দুটো পুকুর, এই জোড়া হ্রদের জন্যই জায়গার নাম জোড় পোখরি। কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়ায় এতটাই ঠান্ডা লাগছিল যে রুমহিটার নিতে হল। গরম গরম খাবার খেয়ে আমরা সে দিনের মতো যে যার ঘরে লেপ কম্বলের মধ্যে সিঁধিয়ে গেলাম। খুব ভোরে ঘুম ভাঙল। ঝকঝকে আকাশ আর সামনে অপরূপা কাঞ্চনজঙ্ঘা তার মোহিনী রূপে মাথায় সোনার মুকুট পরে উপস্থিত। সে দৃশ্য বর্ণনা করার ক্ষমতা ঈশ্বর আমাকে দেননি, শুধুই মুগ্ধতায় ঈশ্বরের এই অসীম দান প্রাণ ভরে গ্রহণ করলাম। কিন্তু কিছুক্ষণ না যেতেই নেমে এল মেঘমালা, ঢেকে দিল আশপাশ। একটু আগের রূপের সঙ্গে কোনও মিল নেই এই কুয়াশা ভরা সকালের। দিন যত বাড়ল, কুয়াশা ততই ঘন হতে লাগল। সামনের শান বাঁধানো পুকুর একটা বিরাট সাপের মূর্তি যেন এই কুয়াশায় কেমন জীবন্ত মনে হচ্ছিল। জ্বলে সাঁতার কাটছে বেশ কিছু হাঁস, দূরের বাগানটায় চরে বেড়াচ্ছে আরও কতগুলো। পুকুর দুটি ঘিরে যত্নে লালিত মরশুমে ফুলের সারি আর তারপর সীমানা প্রাচীরের মত পাইন গাছের সারি, এক অসামান্য মেল বন্ধনে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে ছিলাম।

মিরিকের পথ ধরে নিলে ফিরতে সময় লাগার কথা সাড়ে তিন ঘন্টা। তাই সকালটা ঘুরলাম চারিদিকে। আমি তখনও আমার চাতক মনটাকে ভিজিয়ে নিচ্ছিলাম এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে। ফেরার সময় নেপাল বর্ডারের এর কাছে পশুপতি মার্কেটে ঘোরা হল না, কারণ আতিমারির কারণে প্রবেশ নিষিদ্ধ। কিন্তু তাতে দুঃখও নেই, যে দৃশ্য মন ভরে দেখেছি সেটা ফিরে অনেক দিন অক্সিজেন দেবে, বেড়ানোর এটাও একটা সুখ যে ঘুরে এসে সেই সুখ স্মৃতিকে মনে করে ঘটনার জাবর কেটে প্রতিটা মুহূর্ত আবার নতুন করে স্মৃতি পটে ফুটিয়ে তোলার আনন্দই আলাদা।

আপনার বেড়ানোর গল্প

শীত বা গ্রীষ্ম, বর্ষা বা বসন্ত, প্রায় সব ঋতুতেই বাঙালির মন উড়ু উড়ু। নদী, পাহাড়, সমুদ্র, জঙ্গল— সে কোথাও না কোথাও বেরিয়ে পড়তে চায়। বেরিয়ে পড়েও। সবার ঝুলিতেই বেড়ানোর অনেক গল্প জমে থাকে। ভাল লাগা, মন্দ লাগা— নানা অনুভূতি সে ভাগ করে নিতে চায়। কেউ ম্যাগাজিনে লেখে, কেউ ফেসবুকে লিখেই তৃপ্ত হয়। কেউ অনেককিছু লিখব ভাবে, কিন্তু লেখা আর হয়ে ওঠে না।

আপনার বেড়ানোর সেই ডায়েরি যদি বেঙ্গল টাইমসে উঠে আসে, কেমন হয়! লিখে ফেলুন আপনার অভিজ্ঞতার কথা। 'কীভাবে যাবেন, কোথায় থাকবেন মার্কা' টিপিক্যাল ছকে বাঁধা ভ্রমণ কাহিনী নয়। আপনি লিখুন আপনার মতো করেই। কোনও ফর্মুলা মেনে নয়, যা লিখতে ইচ্ছে করছে, আপনি সেটাই লিখবেন। বেড়ানো মানে পুরো সফরের বর্ণনা নয়। টুকরো টুকরো কত মুহূর্ত, কত মানুষ, যা খুশি লিখতে পারেন। নমুনা দেখতে হলে একবার বেঙ্গল টাইমসের ভ্রমণ বিভাগে উঁকি মারতে পারেন। এমন নানা লেখা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।

অনেকেই লেখালেখির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত নন। তাই অনেকের মধ্যেই লেখার আগে একটা হীনমন্যতা এসে যায়। সেই হীনমন্যতা ঝেড়ে ফেলুন। আপনি শুধু আপনার অনুভূতির কথা লিখুন। খারাপ হল না ভাল হল, সেই ভাবনা শিকেয় তুলে রাখুন। কোথাও কিছু অসঙ্গতি থাকলে সম্পাদনার পর তা দেখবেন ঠিক হয়ে গেছে। আপনার লেখা সাজিয়ে নেওয়ার দায়িত্ব আমাদের।

সাহস করে লিখুন। পাঠিয়ে দিন বেঙ্গল টাইমসের ঠিকানায়। আর হ্যাঁ, সঙ্গে ছবি থাকলে, তাও পাঠিয়ে দিন। যদি ছবি না থাকে! চিন্তার কিছু নেই। সবজান্তা গুগল তো আছেই।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা
bengaltimes.in@gmail.com

গোলপাহাড়ের টিলায় বসে...

শ্যামল মুখার্জি

পাহাড় বলবেন নাকি ছোট ছোট টিলা! দলমা রেঞ্জের দিকে গেলে এমন কত অসংখ্য টিলা দেখা যায়। কোনওটা রুক্ষ, কোনওটা আগাছায় ঢাকা। ট্রেনে যেতে যেতে বা বাসে যেতে যেতে দূর থেকেই সেইসব টিলা দেখেছি। কাছে যাওয়া হয়নি। কী জানি, যদি সাপখোপ থাকে! যদি বন্য জন্তু থাকে। তাছাড়া, ওই টিলায় কোন বাস দাঁড়াতে যাবে! কেনই বা দাঁড়াতে যাবে!

এই টিলা একেবারেই অন্যরকম। পাহাড়ের ঢালে চা-বাগান নতুন কিছু নয়। পাহাড়ের পাকদণ্ডি বেয়ে উঠতে উঠতে এমন কত বাগান উঁকি দেবে। কিন্তু এই গোলপাহাড়ের সৌন্দর্য অন্যরকম। একের পর এক ছোট্ট গোল গোল পাহাড়। সবগুলিই প্রায় একই উচ্চতার। সব ছোট পাহাড়গুলোই চা-গাছে ঘেরা। ধূসর বা রুক্ষ বাগান নয়, চরাচরজুড়ে সবুজের অভিযান। দু'পাশে দুটো গোল পাহাড়, মাঝের রাস্তা দিয়ে আপনি হেঁটে যাচ্ছেন, দৃশ্যটা ভাবলেই অদ্ভুত এক রোমাঞ্চ এসে যায়।

এই পথে বেশ কয়েকবার পেরিয়ে গেছি।

মিরিক থেকে দার্জিলিং ওঠার রুট। শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিং যাওয়ার একটা রাস্তা উঠে গেছে কার্শিয়াং হয়ে। অঞ্জন দত্তর গানের ভাষায়, টুং, সোনাদা, ঘুম পেরিয়ে। সবাই এই রাস্তা দিয়েই ওঠেন। কারণ, সময় কিছুটা কম লাগে। কিন্তু হাতে যদি একটু বাড়তি সময় থাকে, তাহলে একবার মিরিক হয়ে উঠতে পারেন। যাওয়ার পথেই নেপাল সীমান্ত, টুক করে একবার ঝটিকা সফরে বিদেশ ভ্রমণ করে নিতে পারেন। নিদেন পক্ষে ওপারে গিয়ে এক কাপ চাও খেয়ে আসতে পারেন। আবার ভারতের ভূখণ্ডে ফিরে এসে সুখিয়া পোখরি, লেপচা জগৎ, ঘুম হয়ে দার্জিলিং পৌঁছে যেতে পারেন।

দূরত্ব একটু বেশি ঠিকই, তবে চা-বাগান আর পাইন বনে ঘেরা রাস্তা একটা বাড়তি রোমাঞ্চ এনে দেবে। আমাদের এই গোলপাহাড় অবশ্য এতটা দূরে নয়। তার অনেক আগেই। ধরে নিন মিরিক থেকে আরও আধ ঘণ্টার মতো। এখানে

পাহাড়টা একেবারেই অন্য রকম। ছোট ছোট টিলা। সাহেবরা চা-বাগান বানাতে গিয়ে দৃষ্টিনন্দন ব্যাপারটাও মাথায় রেখেছিলেন। এই রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেলে, আর কোথাও যাওয়ার দরকার পড়বে না।

এর সন্ধান দিয়েছিলেন তাবাকোশির বিজয় সুব্বা। তাঁর হোম স্টেতেই ছিলাম। কিন্তু সেখান থেকে কোথায়? সেই সিদ্ধান্তের ভার তাঁর ওপরই ছেড়ে দিয়েছিলাম। তিনিই বলেছিলেন, নেপাল সীমান্তের কাছে একটা গ্রাম আছে, একেবারে চা-বাগানের মাঝেই। দেখুন, আপনাদের ভাল লাগবে। তিনিই সন্ধান দিয়েছিলেন মঞ্জোশীলা হোম স্টের। আসলে, তাবাকোশি এতটাই ভাল লেগেছিল যে সংশয় হচ্ছিল, পরের জায়গাটা যদি ভাল না হয়। কিন্তু গন্তব্য যত এগিয়ে আসছে, মুগ্ধতা যেন তত বাড়ছে। পাইন গাছের জঙ্গল থেকে মেঘ ভেসে আসছে। সঙ্গে দিগন্ত বিস্তৃত চা-বাগান তো আছেই। যেখানে দাঁড়াবেন, সেখানেই ভিউ পয়েন্ট।

দুপুর নাগাদ পৌঁছে গেলাম মঞ্জোশীলায়। একমুখ হাঁসি নিয়ে হাজির মনোজ তামাং। ভারী চমৎকার মানুষ। এমন সরল, আন্তরিক ও অতিথি পরায়ণ মানুষ চাইলেও ভুলতে পারবেন না। পুরো বাড়িটাই পাইন কাঠে মোড়া। সামনে ছোট্ট একফালি উঠোন। সেখানে

বসলেই হাতের সামনে ধরা দেবে সেই গোলপাহাড়। ঘরের বিছানায় বসে মনে হবে, জানালার ওপারেই যেন চা বাগান। এত কাছ থেকে এমন সুন্দর বাগান দেখার রোমাঞ্চই আলাদা। মনের মধ্যে জমে থাকা নাগরিক ক্লান্তি, অবসাদ, বিরক্তি একলহমায় যেন হারিয়ে যায়। মনে হবে, চুলোয় যাক কাজবাজ, চুলোয় যাক ব্যস্ততা। সব ছেড়ে এখানেই থেকে যাই। সঙ্গে যদি এমন আতি-থেয়তা থাকে, তাহলে তো কথাই নেই। একটা ছোট্ট সতর্কীকরণ: দিনের বেলা বেশ রোমাঞ্চকর। তবে সূর্য ডুবলে হঠাৎ ঠাণ্ডা পড়ে। তাই পর্যাপ্ত শীতপোশাক নিয়ে যাওয়াই ভাল।

আলাদা করে কোনও গাড়ি নেওয়ার দরকার নেই। আলতো পায়ে হেঁটে হেঁটে এগিয়ে যান গোলপাহাড় ভিউ পয়েন্টের দিকে। হাঁটা পথে মিনিট দশ। দু-পাশে খাড়া চা-বাগান। আপনি আপন মনে হেঁটে যান। যতদূর মন চায়। কখনও ইচ্ছে হলে কোনও এক টিলায় উঠে পড়ুন। ছবি তোলার শখ থাকলে এটুকু হলফ করে বলা যায়, আপনার সেরা মুহূর্তগুলো হয়ত এই গোলপাহাড়ের জন্যই তোলা আছে। কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখার জন্য ঘটা করে টাইগার হিল যেতে হবে না। হোম স্টের সামনের ওই ছোট্ট পাহাড়ে উঠে পড়ুন। পাহাড় শুনে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। উঠতে লাগবে বড়জোর মিনিট দশেক। বয়স্করাও অনায়াসে উঠে পড়তে পারেন। একটু শুধু সাত সকালে উঠে পড়ুন। সকালের প্রথম সূর্যরশ্মি কীভাবে কাঞ্চনজঙ্ঘার ওপর ঠিকরে পড়ছে, কীভাবে তুষারশুভ্র কাঞ্চনজঙ্ঘা ছন্দে ছন্দে রঙ বদলাচ্ছে, দেখতে থাকুন। কখনও হয়ে উঠছে বাদামি, কখনও সোনালি, আবার কখনও ঝকঝকে সাদা।

ছবি কত কথা বলে যায়! গুগলবাবু তো আছে। একবার গোলপাহাড় লিখে দেখুন। তাহলেই ছবিটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। চাইলে ইউটিউবের শরণ নিতেই পারেন। একবার শুধু একঝলক দেখে নিন। যেমন দেখছেন, তার থেকে ঢের ভাল। তথাকথিত দার্জিলিং, গ্যাংটক তো অনেক দেখেছেন। এবারের ঠিকানা হোক একটু নিরিবিলিতে। ওই গোলপাহাড়ে অলসভাবে দুটো দিন কাটিয়ে আসুন।

বেঙ্গল টাইমস

১৫ এপ্রিল, ২০২৫

ISSN 2445 5657

bengaltimes.in